ছেলেদের
হাতের
কাজ

ছেলেদের হাতের কাজ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মুল্য দুই টাকা

ছোটদের 'স্বপন বুড়ো'

বন্ধুবর

শ্রীঅখিল নিয়োগীর

করকমলেষু—

ভূমিকা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য—এ সত্য মেনে নিয়েও কি ভাবে তা সম্ভব হতে পারে, তা নিয়ে ইংরেজ আমলে কাগজে কলমে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে ; কিন্তু কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা তখনও অবলম্বিত হয় নি, আজ এ স্বাধীনতার যুগেও হয় নি। অবশ্য দু'চারটি বিদ্যালয় সে আমল থেকেই নিজেদের উদ্যমে ও দায়িত্বে হাতে-কলমে ছাত্রদের কিছু কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় একদিকে তা যেমনই সামান্য, অপরদিকে সরকারের উৎসাহের অভাবে তা একেবারেই উপেক্ষিত।

শিশু স্বভাবতই সৃজনশীল। তার সৃজনী প্রতিভা অরূপকে দেয় রূপ। সে নিজের মনে গড়ে, আবার ভেঙ্গে দেয় তার সৃষ্টিকে। আবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে। এই ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়েই চলে তার সুন্দরতমকে লাভ করবার সাধনা।

শিশুর এই সহজাত সৃষ্টি-সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া কোন শিক্ষাবিধিরই কাম্য হতে পারে না। কোন স্বাধীন দেশ শিল্প-সৃষ্টির এত বড় একটা বিরাট সম্ভাবনাকে বৃথা যেতে দিতে পারে না। বাংলার জাতীয় সরকার প্রত্যেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করে বাঙালী ছেলেমেয়েদের স্বভাবজাত শিল্প-সৃষ্টির যে প্রবৃত্তি এতদিন অবজ্ঞাত হয়েছিল, তাকে উন্মেষিত করবার সুযোগ করে দিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নয়। এ ব্যবস্থায় কুটীর-শিল্পের উন্নতি নিশ্চিত হয়ে উঠবে।

বাঙালী শিল্প-সৃষ্টিতে কারও চেয়ে হীন নয় ; অথচ উৎসাহ ও সুযোগের অভাবে, তার প্রতিভার বিরাট অপচয় ঘটছে। এর ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সাধারণ শিল্পদ্রব্য, বিশেষ করে শিশুদের খেলনা, বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে দেশকে করছে পঙ্গু।

এই পুস্তকের গ্রন্থকার প্রীতিভাজন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী নিজে একজন খ্যাতিমান্ শিশু-সাহিত্যিক, ওস্তাদ শিল্পী ও দক্ষ শিল্প-শিক্ষক। নীরস বিষয়বস্তুকে সরস করে বলবার ক্ষমতা তাঁর আছে। শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বহু প্রবন্ধ 'শিশুসাথী' পত্রিকায় পড়ে অনেক ছেলেমেয়ে এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে থাকে। তাঁর লেখা 'বাংলার কুটীর-শিল্প' একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ। বাংলার এক অবজ্ঞাত বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

'ছেলেদের হাতের কাজ' শিশুদের শিল্প-শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় সরকারকে হয়ত পথ দেখাতে পারবে। এ ছাড়া সকলেই এ পুস্তকখানি নিজে নিজে পড়ে নানা জিনিস তৈরী করতে পারবেন। আমাদের এ দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত দেশে বৃথা সময়ক্ষেপ না করে পরিপূরক বৃত্তি হিসেবে এ সব সাধারণ জিনিস তৈরী করতে শিখলে প্রভূত উপকার হবে।

'শিশুসাথী' কার্য্যালয়
২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারা হবে স্বাধীন। আত্মরক্ষার ভার তাদের নিজেদেরই হাতে।

কোনও রকমে দু-চারটে পাস দিয়ে ইংরেজের গোলামী করবার দিন চলে গেছে। সে মনোবৃত্তিটাকেও আমাদের ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজেও আমাদের পারদর্শী হওয়া চাই—যাতে আমরা স্বাবলম্বী হতে পারি।

ছেলেদের অল্প বয়স থেকেই যাতে বিভিন্ন শিল্পকাজ শিখবার রুচি হয়, যাতে তারা হাতের কাজে আনন্দ পায় এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান বইখানি লিখিত হয়েছে। বাঙালীর ছেলের প্রতিভা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই বইখানি থেকে উৎসাহী ছেলেদের কিছুমাত্র সাহায্য হলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি

বি. পি. টেকনিক্যাল স্কুল
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

অনুক্রম

বাংলার অবজ্ঞাত শিল্পী

সত্যিকারের শিল্পী আমাদের দেশে নেই ব'লে অনেকে দুঃখ করেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের দেশে অনেক অজ্ঞাত ও অখ্যাত শিল্পী আছে, যারা সুযোগ ও উৎসাহের অভাবে চিরদিন লোক-চক্ষুর পেছনে বাস করছে।

এই দেশের কামারই বিরাট কামান তৈরী করেছিল। আবার অক্ষরের ছাঁচও এই দেশের কামারই তৈরী করেছে। লাঠি-চালনা ও নৌ-বিদ্যায় বাঙ্গালী একদিন অজেয় ছিল। ফুল দিয়ে নানা রকম গহনা তৈরী, কাগজ ও শোলা দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা, বেত ও বাঁশ দিয়ে নানা রকম দরকারী ঘরের সাজ, পাটের দড়ি দিয়ে নানা রকম নক্সা-আঁকা শিকা, নক্সা-আঁকা কাঁথা, কাঠের ওপর সুন্দর সুন্দর ছবি—এসব বাঙ্গালী করতে পারত এবং এখনও বহু জায়গায় পারে।

সুযোগ পেলে বাঙ্গালী শিল্পী নতুন নতুন শিল্পের পরিচয় দিতে পারে। টিনের খেলনা-ষ্টীমার বাঙ্গালীর শিল্পীর উদ্ভাবনী-শক্তির চিহ্ন। বাঁশ, দড়ি, তার, কাগজ, এই সকল সামান্য জিনিস দিয়ে অনেক বাঙ্গালী শিল্পী কত রকম খেলনা তৈরী করেছেন। কিন্তু জাপানী সস্তা খেলনার পাল্লার বাজারে তাঁরা হটে গিয়েছেন এতকাল। দেশের লোক দেশী শিল্পীর জিনিস কিনবে না, দেশের শিল্পীকে একটুও উৎসাহ দেবে না। সুতরাং তাঁদের শিল্প কি ক'রে চলবে? আমাদের রুচি অনুসারে রোজ রোজ নতুন নতুন সস্তা জিনিসের টোপ্ ফেলে জাপান ওৎ পেতে ব'সে ছিল, আর আমরা সেই টোপ্ গিলে মহা-আরামে সাঁতরে মরণের পথে গিয়েছি!

একজন শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছিল। তার কথাই আজ এখানে বলব।

কোনও সময়ে আমার ফটোর ক্যামেরাটি সারানোর দরকার হয়। কলকাতায় পাঠিয়ে সেটা ঠিক ক'রে আনা সময়-সাপেক্ষ। অথচ তাড়াতাড়ি একটা ফটো তোলার দরকার। এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন—"অমরেশ কর্ম্মকারের কাছে যাও, অমন কারিকর এ অঞ্চলে নেই।"

কিন্তু সহরের কোন্‌খানটায় তার কারখানা এ কথা জিজ্ঞেস ক'রে যে উত্তর পেলাম, তাতে তার কাছে যাবার আর ইচ্ছে হ'ল না। গোয়াড়ী সহরে এত দোকান, বড় রাস্তার ওপর এত সাইকেল, ঘড়ি, গ্রামোফোন সারানোর কারখানা—এর মধ্যে সেই সুবিখ্যাত কারিকরের খোঁজ মিলবে না! সে কৃষ্ণনগরের একধারে কোন্ বনের মধ্যে নিজের বাড়ীতেই থাকে!

অতএব ক্যামেরাটা অগত্যা কলকাতাতেই পাঠালাম। একুশ দিন পরে সাড়ে সাত টাকা খরচ ক'রে যখন সেটা ফেরৎ পেলাম তখন দেখা গেল, তার একটু উন্নতি হয়েছে,—অর্থাৎ 'সাটার'টা যে ঘাটটায় পড়ত না সেটা এখন ঠিক হয়েছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে বেঠিক না হয় এমনও নয়।

এই অবস্থাটাকে উন্নতি না বলে অবনতিই বলা যায়। কারণ আগে জানতাম, ও ঘাটটায় 'সাটার' পড়ে না, কিন্তু এখন সেটায় সন্দেহ থাকল।

'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' হতে পারে, কিন্তু কোনও কিছু না থাকার চেয়ে সন্দেহ থাকা আরও মারাত্মক।

কালেক্টরীর এক বন্ধু বললেন—"ভায়া, অমরেশের কাছে যাও। আমাদের টাইপরাইটার মেসিনটা কলকাতায় সাহেব কোম্পানীর কাছে পাঠিয়ে সারাতে দাম পড়েছিল একুশ টাকা, কিন্তু এক মাস পরেই 'যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্'। অমরেশের কাছে পাঠান হ'ল, তিন টাকা মজুরী নিল; কিন্তু সারিয়ে যা দিয়েছে চমৎকার।"

কথাচ্ছলে একদিন বন্ধু মন্মথ বলল, তাদের আটার কলটা বিগড়ে গেলে অমরেশকে দিয়ে ঠিক ক'রে নেয়। তারপর থেকে সেটা ঠিকই চলছে।

অমরেশ সম্বন্ধে এই সব প্রশংসাবাক্য শুনেও ক্যামেরাটি এই গেঁয়ো কামারের কাছে দিতে আমার ইচ্ছে হয় নি।

অমরেশের কথা উঠতেই আবার একজন ভদ্রলোক বললেন—"সেবারে অমুক মহকুমার ট্রেজারী-অধ্যক্ষকে বাঁচিয়ে দেয় অমরেশ, আটক থাকার হাত থেকে।"

বললাম—"কি রকম?"

তিনি বললেন—"ট্রেজারী সিন্ধুকের তালাটা খারাপ হয়ে গেছল। ওপর থেকে লোক এল, আর হুকুম এল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে নেবে। কিন্তু কাজ আর শেষ হয় না! ট্রেজারার বেচারা ত একদিন একরাত্রি সেই ঘুমটিখানা ট্রেজারীতে খাড়া উপস্থিত! তারপর অমরেশের নামে টেলিগ্রাম এল—কাম এ্যাট্ওয়ান্স! অমরেশ গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক ক'রে দিয়ে এল।"

কিছুদিন পরেই আমার ক্যামেরাটার সব খারাপ হয়ে গেল। একদিন এই কামারের খোঁজে বের হলাম। কৃষ্ণনগরের একধারে গিয়ে দেখি, অমরেশ তার নিজের পুরানো কোঠাবাড়ীতে ব'সে কাজ করছে। জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি সহরের ওপর একটা দোকান না ক'রে এখানে থাক কেন?"

অমরেশ বিনীত স্বরে বলল—"আজ্ঞে, বাপ-পিতামহের ভিটে; আপনারা দশজন ভদ্রলোক এখানে পায়ের ধুলো দেবেন, সেটা কি কম সৌভাগ্যের কথা!"

বললাম—"লোকে এখানে আসবে কেন?"

অমরেশ হাসল, বলল—"আজ্ঞে, দরকার হলেই আসবেন।"

অমরেশের দোকান ঘর দেখলাম। সেখানে বন্দুক, হারমোনিয়াম, ক্যামেরা, গ্রামোফোন, সেলাইয়ের কল ও পেট্রোমাক্স প্রভৃতি—সারানোর জন্যে না এসেছে এমন জিনিস নেই!

অমরেশ ছোটবেলা থেকেই তার বাবার কাছ থেকে কাজ শিখেছিল। লৌহ-শিল্প তাদের জাত-ব্যবসা। অন্য জায়গায় গিয়ে সে কলকব্জার কাজও শিখে এসেছে। মাটির কাজ, কাঠের কাজ, পেতল, লোহা ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য সকল রকম কল-কব্জার কাজে অমরেশ ওস্তাদ।

আমাকে বসতে দিয়ে বলল—"প্লেট এনেছেন সঙ্গে ক'রে?"

বললাম—"ফটো উঠবেই না, তার প্লেট দিয়ে কি হবে?"

অমরেশ বলল—"একটা প্লেট পেলে ফটো ওঠে কিনা দেখা যেত। এখনও ত বেশ লাইট আছে।"

অবাক্ হয়ে ভাবলাম—লোকটা বলে কি?

প্লেট আনালাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার ক্যামেরাটার যত দোষ ছিল সব সে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ক'রে দিল। তখনই সেই ক্যামেরায় তার একটা ফটো তুললাম।

ক্যামেরাটা আমার এখনও পর্য্যন্ত ঠিকই চলছে। রেডিও, ইলেকট্রিসিটি ও ডায়নামো সম্বন্ধে অমরেশের জানবার ইচ্ছে দেখে আমি অবাক্ হলাম। অমরেশ নিজের হাতে একটা বৈদ্যুতিক পাখা, একটা খেলনা হাওয়ার বন্দুক, কল-টিপলে শিস্ দেয় এমন টিনের পাখী—এই সব তৈরী করেছে দেখলাম।

বাঙ্গালাদেশে এইরকম প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নেই। তারা সুযোগ ও দেশের লোকের উৎসাহ পেলে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু দেশী শিল্পী দেশের লোকের অবজ্ঞায় কিছুই না করতে পেরে ব'সে আছে!

বাংলার অখ্যাত শিল্পী

রথের বাজার থেকে মণ্টু একটা খেলনা কিনে আনছিল। শৈলেনবাবু বললেন—"বেশ সুন্দর খেলনা ত, কত দাম নিয়েছে ?"

—"এক আনা !"

অপূর্ব্ব পাশে দাঁড়িয়েছিল,—বলল—"বেজায় সস্তা ত !"

রথীনবাবু বললেন—"এত সস্তায় কি ক'রে দেয় তাই ভাবি !"

আর এক ভদ্রলোক বললেন—"জাপান, জাপান মশাই ! আপনার দেশের সাধ্য নেই যে অত সস্তায় দেয়।"

অপূর্ব্ব বলল—"আমাদের দেশে অমন করতেই পারবে না কেউ !"

রবি দেশের নিন্দে সইতে পারে না। সে বলল—"আচ্ছা বেশ, আমি তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"
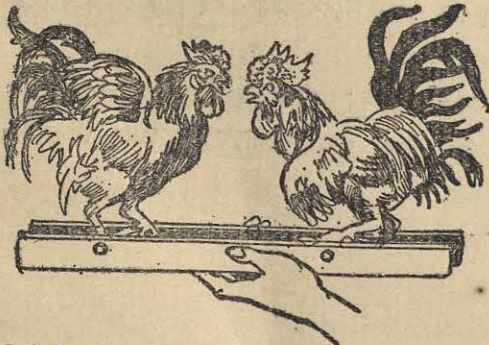
খেলনা বিশেষ কিছু নয়,—দুটি সুন্দর মোরগ—খেলনার নীচের দিক্‌টা টিপলে ওরা লড়াই আরম্ভ করে। সেইদিন রাত্রেই পিচবোর্ড কেটে রবি মোরগের লড়াই তৈরী ক'রে দেখিয়ে দিল।

অনেক জাপানী খেলনাই তৈরী করা সহজ। আমাদের দেশে অনেকেই তা নকল করতে পারেন,—কেবল নকল নয়, বাঙ্গালী শিল্পী নিজের প্রতিভা দিয়ে অনেক নতুন জিনিসও তৈরী করতে পারেন।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আমাদের পাড়ার ক্ষুদিরাম বাঁশ বা কাঠ দিয়ে এক রকম খেলনা তৈরী করত। তা তৈরী করতে তার কিছুই খরচ ছিল না। অবসর সময়ে সে তা তৈরী ক'রে পূজো বা রথের মেলায় বিক্রী করত। তার সেই সব খেলনার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

দু হাত লম্বা একটা বাঁশের বাখারী বা 'চটা' (ক, খ) লও। তার দু মাথায় একটা ক'রে ফুটো কর। যন্ত্রের অভাবে একটা লোহার শিক পুড়িয়েও তা করা যায়। চটাটাকে পাশের ছবির মত ক'রে বেঁকিয়ে, ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে বেশ টান টান করে একটা দড়ি (গ) বাঁধ। তারপর পাতলা কোন কাঠ বা শোলা দিয়ে একটা বাঁদর (ঙ) তৈরী কর। ঐ বাঁদরটাকে দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দাও। এরকম করবার পর দেখবে চটাটার বাঁকা দিক্ ধ'রে টিপলেই বাঁদরটা তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাবে!
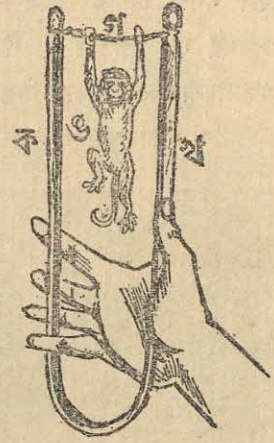
আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশ বছর আগে বাঙ্গালার পল্লী-শিল্পীর কাছে যে খেলনাটা দেখেছি, ওটাই রূপ বদ্‌লে পরে জাপানী 'মান্‌কী-জাম্প' খেলনায় পরিণত হয়েছে!

ক্ষুদিরাম আরও কত খেলনা তৈরী করত, তার মধ্যে একটা বাজনা খেলনার কথা মনে আছে। জাপানীরা সেটা বাজারে চালিয়েছে কিনা জানি না।
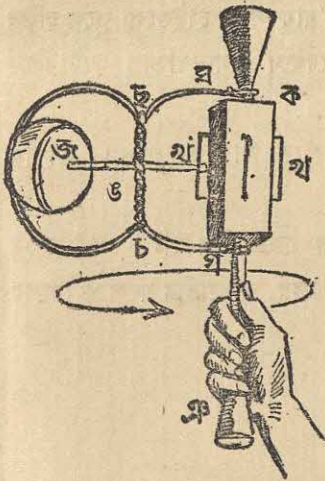
একটা বাঁশ বা কাঠের ওপরের দিক্‌টা কতকটা মোটা রেখে (ক) তার চারদিকে চার-পাঁচটা লোহার তার (খ) ছবির মত ক'রে লাগিয়ে দিতে হবে। এক্সারসাইজ খাতা যে সব লোহার তার দিয়ে আঁটা থাকে, এ তারগুলোর আকারও সেই রকম, কিন্তু তার চেয়ে একটু বড় ও লম্বা হওয়া দরকার। গ ঘ আর একটা লোহার তার, তাকে এমন করে জড়াবে যে, সেটা ঐ কাঠের চারিদিকে বেশ ঘুরতে পারে। ঐ গ ও ঘ তারের মাঝখানটা ঘুরিয়ে তার সঙ্গে বা মাটির চাকার সঙ্গে কোনও চামড়া, সুপুরীর খোলার মধ্যের ছাল বা কোনও শক্ত কাগজে এঁটে দিতে হবে (জ)। ঐ গ ঘ তারের চ ছ জায়গায় বেঁকিয়ে তার সঙ্গে একটা শক্ত সুতো বা সরু দড়ি বেঁধে ঐ দড়ির মধ্যে একটা কাঠি (ঙ) এঁটে দাও। এইবার হাণ্ডেলটা (ঞ) ধ'রে ঘুরোলেই গ ঘ তার ঘুরে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে চ, ছ, জও ঘুরবে, কিন্তু ঐ কাঠিটা (ঙ), খ তারগুলোর ওপর প'ড়ে জ স্থানে বেশ টুম্ টুম্ শব্দ করবে।

ঐ সময়ে আমরা নগণ্য ছোট ছেলেরা পাড়াগেঁয়ে বাতাবীলেবু দিয়ে ফুটবল খেলতাম। ক্ষুদিরাম এক টুক্‌রো বেতের মধ্যে তালপাতা দিয়ে সুন্দর হুইস্‌ল বাঁশী তৈরী করত। ক্ষুদিরাম ছিল নগণ্য চাষার ছেলে—তার ওপর আবার এক পা খোঁড়া! কিন্তু আমরা তাকে কি শ্রদ্ধার চোখেই না দেখতাম! শীতকালে ক্ষুদিরাম আমাদের নিয়ে একপ্রকার 'বাজী' তৈরী করত। এক পয়সাও তাতে খরচ ছিল না।

গাছীরা খেজুরগাছ ঝুরে গেলে তার গোড়ায় খেজুরের 'বাকল' প'ড়ে থাকে—তোমরা, যারা পাড়াগাঁয়ে বাস কর নিশ্চয় তা দেখেছ। ঐ বাকলগুলো কুড়িয়ে এনে অন্ধকার রাত্রের সন্ধ্যেবেলা কোনও ফাঁকা জায়গায়, রাস্তা বা মাঠের মধ্যে যেতে হবে। কতকগুলো বড় 'মান' কচুর পাতা ও পাঁচ-ছ হাত লম্বা একটা দড়ির দরকার। ঐ বাকলগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নাও। এদিকে একটা মানপাতা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বেশ ক'রে ফুটো ফুটো ক'রে নাও। তারপর অল্প আগুন থাকতে ঐ ফুটো ফুটো মানপাতাটাতে 'বাকলের' ছাইগুলো তুলে দড়ির একদিকে একটা ফাঁস দিয়ে বেঁধে ঘুরোতে থাক। একটু পরেই দেখবে ঐ মানপাতার ফুটো দিয়ে প্রচুর ফুল্‌কী বের হয়ে বেশ সুন্দর বাজী হচ্ছে!

ক্ষুদিরাম এখন বেঁচে নেই; থাকলেও তার সে গ্রাম্য-শিল্প পরে আর চলত না। জাপান এসে সে জায়গা দখল ক'রে নিয়েছিল।

এখন চাই বিজ্ঞানের সঙ্গে—আধুনিক রুচির সঙ্গে—সামঞ্জস্য রেখে শিল্প-সৃষ্টি। এই রকম প্রতিভাবান্ শিল্পীও আমাদের দেশে আছে; কিন্তু অনেক বিদেশী শিল্পের আমদানীর ফলে ও দেশের লোকের অবজ্ঞায় তারা কোণঠাসা হয়ে আছে।

স্বদেশী খেলনা
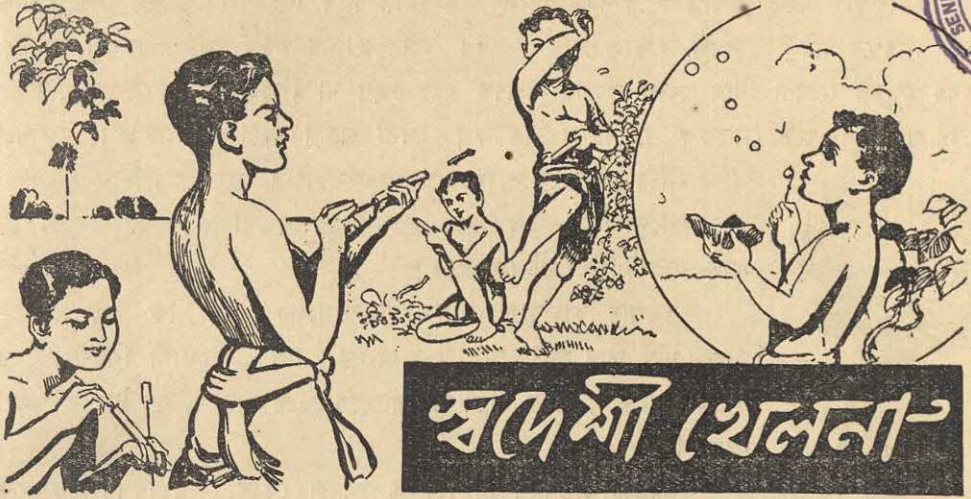
একদল ছেলে রাস্তায় ধূলো নিয়ে খেলা করছিল। একবার ধমক খেয়েও তাদের শিক্ষা হয় নি। এবার তাদের প্রহার করব ব'লে উঠে দাঁড়ালাম। পাশেই কিন্তু আমাদের ঠাকুর্দ্দা ব'সে হুঁকো টানছিলেন ; আমাকে বাধা দিয়ে বললেন—"আহা খেলুক। রাস্তায় ধূলো ছড়াচ্ছে বৈ ত নয়—খেলুক না!"

বললাম—"ওরা ত কচি শিশু নয় ঠাকুর্দ্দা, যে ধূলো ছড়িয়ে খেলা করবে!"

ঠাকুর্দ্দা প্রশ্ন করলেন—"তবে কি নিয়ে ওরা খেলা করবে?"

—"কেন, যা নিয়ে আমরা করেছি—আমরা কি ওদের বয়সে ধূলোখেলা করতাম?"

—"না, করতে না। কারণ, তোমাদের সময়ে অঢেল জাপানী খেলনা ছিল—সস্তায় ফুটবল ছিল—আরও কত কি ছিল। কিন্তু ওরা সে-সব পাবে কোথায়? জাপানী মাল এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাজারে পুরনো খেলনাপত্র যা-কিছু মজুত আছে, দোকানী তার দাম হাঁকছে পাঁচগুণ! যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কেন বাপু, মার্ব্বেল, ভেঁপু বাঁশী, খেলনা-বন্দুক, ঝুনঝুনি এসবও কি কণ্ট্রোল নাকি?' অমনি দোকানী বলবে, 'আমদানী নেই, দেব কি ক'রে?' যদি বল, 'কিন্তু পাঁচ বছর আগে যা আমদানী ক'রে রেখেছ সেটাও ত একটু কম দামে ছাড়তে পার?' দোকানী বলবে, 'তবেই হয়েছে! বিক্রয়-কর দিতে হচ্ছে না?'

এই যখন অবস্থা—তখন খেলনা নিয়ে যারা খেলা করবে সেই ছোট ছেলেদের উপায় কি এখন বল দেখি! ধূলো কি আর সাধ ক'রে ছড়ায় ওরা!"

ভাববার বিষয় বটে। নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বললাম—"দেশী খেলনাটেলনা যা হয় খেলুক না কেন ওরা।"

ঠাকুর্দাও একটু যুতযাত ক'রে ব'সে বললেন—"এইবার পথে এস দাদা! কিন্তু দেশী খেলনা ওরা পাবে কোথায়? লোকে ত ভুলে গেছে সে-সব। প্রায় ছাপ্পান্ন বছর আগের কথা। আমরা তখন যে-সব খেলনা নিয়ে খেলা করেছি—তাতে খরচ ছিল না কিছুই; কিন্তু সে-সব খেলনার খবর রাখে এখন ক'টা লোকে? ছেলেদের দোষ কি? খেলা তাদের একটা কিছু চাই ত। তোমরা ঘরের মাটির প্রদীপ ফেলে দিয়ে পরের জমকালো আলোর পিছনে ছুটলে—দূরের আলো দূরেই চ'লে গেল; এখন অন্ধকারে তোমার নিজের ঘরে হাতড়ে মরছ—দোষটা কি ছোট ছেলেদের?

(১)

"মেলায় আজকাল যে দুচারটে কাগজের ফুল (১) কি বাঁশী দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই প্রায় অ-বাঙ্গালীর তৈরী। সরকারী শিল্প-বিভাগের কথায় জানা যায়, যুদ্ধের আগে বাঙ্গালাদেশে বছরে প্রায় আটলক্ষ টাকার খেলনা আসত বিদেশ থেকে!"

অবস্থাটা এতখানি দাঁড়াবে এ আমরা ভেবে দেখি নি। ঠাকুর্দাকে বললাম—"আচ্ছা, পঞ্চাশ বছর আগে আপনাদের খেলনাগুলো কি ক'রে তৈরী হ'ত বলুন শুনি।"

ঠাকুর্দা বললেন—"প্রথমেই ধর বন্দুক (২)। একটা ছোলা কি মটর-কলাই ঢুকতে পারে এমন একটা ফাঁপা বাঁশের কঞ্চির টুকরোর দুই গিঁটের মাঝখানের অংশটা কেটে নাও (ক)। তারপর ঐ নলের ভেতর দিয়ে সহজে উঠা-নামা করতে পারে এমন একটা কাঠি তৈরী কর (খ)। ঐ নলের মুখে জিউলী, আস্শ্যাওড়া—কি অনুরূপ কোনও ফল দিয়ে কিংবা কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়ে নরম ক'রে—তা দিয়ে গুলি পাকিয়ে—ঐ কাঠি দিয়ে ঠেলে দাও নলটির শেষ প্রান্তে। তারপর আর একটা ঐ রকম

(২)

ফল বা কাগজের গুলি ঐ নলের মুখে দিয়ে জোরে ধাক্কা দাও—ঐ কাঠির সাহায্যে নলের ভেতরে, দেখবে বাতাসের চাপ পেয়ে নলের মুখের আগেকার ফল বা গুলিটি বেশ শব্দ ক'রেই সজোরে বেরিয়ে যাবে। জিউলীর ফলে বেশ একটু ধোঁয়াও হয় দেখা গেছে। জাপানী খেলনা-বন্দুকের চেয়ে এ বন্দুক কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

"ভাল ফ্লুট বাঁশী সরু বাঁশ থেকেই তৈরী হয়। তা' ছাড়া বাঁশ দিয়ে খেলনা-বেহালাও তৈরী করা যায়। নলগাছ দিয়েও বাঁশী তৈরী হয়ে থাকে (৩)। একটা অপেক্ষাকৃত সরু নলের একদিকের খানিকটা পাতলা অংশ তুলে নাও (ক)। তারপর সেটাকে অপেক্ষাকৃত মোটা নলের মধ্যে (খ) পুরে নিয়ে ফুঁ দিলেই বেশ বাজবে।

(৩)
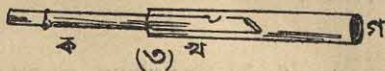
"খেলনা-বাঁশী তালপাতার বা নারিকেলের পাতারও বেশ ভাল হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমের আঁঠি বেড়ার গায়ে কি শানের উপর ঘসে' নিলেও বেশ সুন্দর বাঁশী হতে পারে।

"ভেঁপু বাঁশী তৈরী করতাম আমরা পেঁপের ডাঁটা দিয়ে (৪)। এই ডাঁটার সরু দিকের পাতার অংশটা কেটে ফেলতে হয়। ডাঁটার গোড়ার দিকটা মোটা এবং সেদিকে কোনও ছিদ্র থাকে না। মেটে আলুর পাতা হাতে বেশ ক'রে রগড়ে নিলে তা' থেকে একটা খুব পাতলা শক্ত চামড়ার মত জিনিস বেরিয়ে আসে। ওটা ঐ পেঁপের ডাঁটার সরু অংশের মুখে বেঁধে নিতে হয়। ডগায় দুটো ছিদ্র রাখবার প্রয়োজন। একটা ছিদ্রে ফুঁ দিলে অপর ছিদ্র দিয়ে ভেঁপু বাঁশীর সুর বেরিয়ে আসবে।
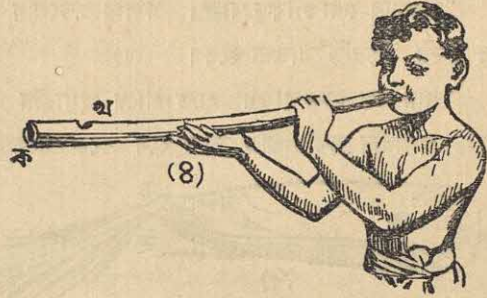
"আগেকার দিনে কুমোরেরা মাটির কুকুর, পাখী প্রভৃতি পুতুল (৫) তৈরী ক'রে, আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে রং ক'রে বিক্রী করত। সেই সব পুতুলের লেজের মাথায় একটা ছিদ্র (ক) থাকত। ওখান দিয়ে ফুঁ দিলে আর একটা ছিদ্রপথে (খ) ঐ বাতাসটা ধাক্কা খেয়ে বাঁশীর সুর নিয়ে বেরিয়ে আসত।

"আর এক রকম বাঁশী তৈরী করা হ'ত। সেগুলোকে ফুঁ দিয়ে না বাজিয়ে একটা সুতোর সঙ্গে বেঁধে ঘুরিয়ে বাজান যায়। সেগুলোকে 'ফিঙে বাঁশী'ও বলা যেতে পারে (৬)।

"ফিঙে বাঁশী কি ভাবে তৈরী হয় বলছি। একটা কাঠির মাথায় একটু সুতো বাঁধ (ক); সেই সুতোর সঙ্গে একটা শোলা কি কাঠের তৈরী পাখীর (খ) মাঝখানটা বেঁধে নাও। আর একটা কাঠির (গ) একটা দিকে থাকবে এক-খানা টিনের চাকতি (ঘ) এবং ঐ পাখীর নখে থাকবে টিনের পাত। ঐ প্রথম কাঠিটার সঙ্গে ঐ টিনের পাত থাকবে মোড়া। দ্বিতীয় কাঠির অন্য দিকে থাকবে রঙিন তালপাতার পাখা—ঠিক তীরের মুখে যেমন থাকে। আর ওটার গায়ে মোড়া টিনের পাতটিতে একটা সরু কাঠির মত
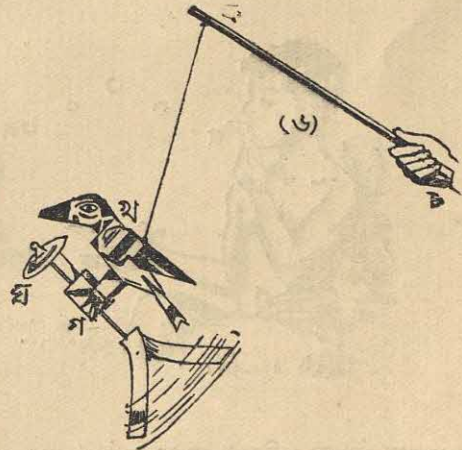
থাকবে। সেটা গিয়ে লাগবে ঐ টিনের চাকতিতে। প্রথম কাঠিটি ধ'রে (চ) ঘুরালেই পাখীটি উড়ে উড়ে যেন ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ করছে ব'লে মনে হবে।

"বাজনার কথাও কিছু বলি। কলার ডেগোর দুইপাশ ছুরি দিয়ে চিরে ঐ চেরা অংশ ভেঙ্গে নিলে সুন্দর 'চড়বড়ি' বাজনা হবে।

"আর এক রকম বাজনা হতে পারে সুপারীর 'ডেগো' থেকে, পাতলা চামড়ার মত খোসা দিয়ে। সুপারীর ডেগো গাছ থেকে খসে পড়ে গেলে ঐ ডেগো থেকে এই জিনিসটা তুলে নিতে হয়।

(৭)
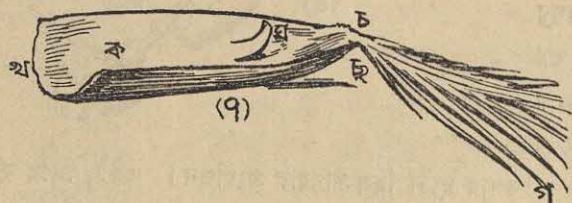
তুলবার অবশ্য কৌশল আছে। ৭নং ছবিতে 'ক' একটি সুপারীর ডেগোর বিস্তৃত অংশ। এর 'খ' চিহ্নিত অংশের নীচে থেকে একটা সরু ফালি তুলে নিয়ে পাতার অংশটা (গ) পা দিয়ে চেপে ধ'রে 'ঘ' অংশে সরু ফালিটা ঢুকিয়ে দিয়ে দু'দিক্ ধ'রে টান দিলে 'ক' চিহ্নিত স্থান থেকে একটা পাতলা, শক্ত চামড়ার মত ছাল বেরিয়ে আসবে। ঐ পাতলা ছালটা কোনও ঘট, সরা কি ঐ ধরনের কোনও কিছুর মুখে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়ে কাঠি দিয়ে বাজালে চমৎকার শব্দ হবে।

"ঐ সুপারীর ডেগোর 'ক' অংশে ব'সে, 'চ, ছ' অংশ দুই হাত দিয়ে ধ'রে থাকলে এবং 'গ' অংশ ধ'রে কেউ টানলে বেশ সর-সর ক'রে ঘাসের ওপর দিয়ে চলবে। এরূপ খেলায় ব্যায়াম ও আনন্দ দুইই হয়।

"এইবার 'বেলুন-বাজী'র কথাও কিছু বলি (৮নং ছবি দেখ)। যে কোনও পাত্রে বা

(৮)

কচুপাতার ঠোঙায় খানিকটা কচার আঠা (গাব ভেরেণ্ডার রস) ধ'রে নাও (ক)। তারপর একটা দূর্ব্বাঘাস তুলে তার একটা দিক্ আংটার মত কর (খ) ঐ ঘাসের অন্যপ্রান্ত ধ'রে আংটাটি

ঐ আঠার মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে এস। তারপর আংটাটি মুখের সম্মুখে ধ'রে আস্তে আস্তে ফুঁ দাও। দেখবে, সুন্দর ছোট-বড় বেলুনের কত ফুলকি বেরিয়ে আসছে ঐ আংটার ভেতর দিয়ে (গ)। সেগুলো বাতাসে যখন ভেসে বেড়াবে তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে সেগুলো ধরবার জন্য। ইচ্ছামত ঐ আঠার মধ্যে বিভিন্ন রং দিয়েও নেওয়া যায়।"

ঠাকুর্দ্দাকে বললাম—"আপনার খেলনা তৈরীর প্রক্রিয়াগুলি পাড়াগাঁয়ে চলতে পারে, কিন্তু সহরে ওসব যোগাড় করাই মুস্কিল। তা ছাড়া কলার ডেগো, সুপারীর খোলা, জিউলীর ফল এগুলো হয়ত সহরে অনেকে চেনেই না।"

ঠাকুর্দ্দা কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে উত্তর করলেন—"তার আমি কি করব! আমার খেলনায় এক পয়সাও খরচা নেই। তোমার সহরে বাবুরা যদি সুপারী কি কলাগাছ না চেনেন, পেঁপের ডাঁটা বা বাঁশের কঞ্চি যদি তাঁদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—ধানগাছে তক্তা হয় কিনা যদি তাঁরা না জানেন, তবে তার জন্য আমি কি করতে পারি?"

বিধুভূষণের সাকরেদ নীলকমল বলেছিল ঃ দা'ঠাকুর, কলম দিয়ে কালীর আঁচড় দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু বেহালা বাজান ?—শুক্‌নো কাঠের ভেতর থেকে সরস কথা বের করে আনতে হবে ! —ওটা অত সহজ নয় !

গাছ দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় ক'রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে, —পাখীতে বাঁধছে বাসা তার ডালে, ঐ গাছ আবার মানুষের কোন কাজে আসবে এ কেউ ভাবতে পারে ?

কিন্তু মানুষ ঐ গাছ দিয়ে সাজাল তার বৈঠকখানা ঘর। চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারী কত কি করল তৈরী ! এটা কি সহজ কথা ! আমাদের দেশ একদিন এই কাঠের কাজে জগৎ-বিখ্যাত ছিল—আজও মালদহ, বিক্রমপুর এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাটি খুঁড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

জগতে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী ছেলেবেলায় এই কাঠের কাজে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন—তাঁদের সকল নাম আনার মনে আসছে না। ষ্টীফেনসন, যিনি ষ্টিম এঞ্জিনের আবিকর্তা, তিনি কাঠের কাজ খুব ভাল জানতেন, গুটেনবার্গ প্রথমে কাঠ কেটেই ছাপার অক্ষর তৈরী করেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটন নিজের হাতেই তৈরী করেছিলেন—শস্য রাখবার যোল হুয়ারী গোলা আর 'ব্যারেল প্লাও' লাঙ্গল।

যারা নৌকা চালায়, তারা যেমন জোরে দাঁড় টানতে পারলেই বড় মাঝি হয় না, সেজন্য জল চিনতে হয়,—জলের ওপর-নীচের স্রোত, ঢেউ, ঘূর্ণীপাক, উল্টো স্রোত এসব বুঝতে হয় আগে, সেই রকম কাঠ কাটতে পারলেই মিস্ত্রী হওয়া যায় না—আগে কাঠ চিনতে হয়। কোন্ গাছের কাঠ কি গুণ সম্পন্ন, কাঠের আঁশ, গিঁট এইসব সম্বন্ধেও জানতে হয় সব খবর।

কাঠের গুণাগুণ সম্বন্ধে এই সঙ্গে একটি তালিকা দেওয়া গেল। কোন্ কোন্ যন্ত্র কি কি প্রয়োজনে লাগবে তারও একটা সাধারণ বিবরণ দেওয়া গেল স্বতন্ত্র তালিকায়।

কাঠ দিয়ে চৌকী টেবিল, খেলার গাড়ী—যাই-ই কর না কেন, তার সব চেয়ে বড় কথা হবে 'জয়েন'—অর্থাৎ কাঠে কাঠ মিলিয়ে দেওয়া। জয়েন অনেক রকমের হতে পারে—এই সঙ্গে তারও মোটামুটি একটা বিবরণ পাবে।

আমাদের দেশে সাধারণ ব্যবহৃত কাঠ ও তাদের তুলনা-মূলক আলোচনা

(কিউবিক ফিট অনুসারে)

কাঠের নাম	ওজন বা ভারীত্ব	কড়ি-বরগা প্রভৃতির মত ভার ধ'রে রাখবার শক্তি	দৃঢ়তা বা দুমড়িয়ে না যাওয়া	খুঁটির মত ব্যবহারের উপযুক্ততা	আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা	আকার রক্ষা করবার ক্ষমতা	ফেঁসে না যাওয়ার শক্তি	রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করবার ক্ষমতা	ব্যবহার
সেগুন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল. আলমারী, কড়ি, বরগা এবং গৃহের আসবাবপত্র
শিশু	১২০	৯৫	৯০	৮৫	১৪০	৮০	১২৫	১৩০	মজবুত ও শক্ত আসবাবপত্রের জন্য উপযুক্ত
শাল	১৩০	১২০	১৩০	১২০	১৪৫	৫৫	১৪০	১৫০	অত্যন্ত শক্ত এবং আঁশ যুক্ত। রেল লাইনের কাঠ ও ব্রীজ প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত
সুন্দরী	১৫০	১১০	১৩০	১১০	১৩০	৪৫	১৫০	১৭৫	নৌকা ও অস্ত্র-শস্ত্রের হাতল প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত
বাবলা	১২০	১২০	৯৫	১০৫	১৭০	৭০	১৪০	১৮৫	দাম কম; গাড়ীর চাকা, লাঙ্গল, তাঁবুর খুঁটার উপযুক্ত
দেবদারু	৮০	৮০	৮০	৮৫	৬০	৮৫	৯০	৭০	বেড়া, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি সাধারণ কাজে উপযুক্ত
আম	৯৫	৭৫	৮০	৭৫	১০০	৯৫	১০৫	৯০	দাম কম; প্যাকিং প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ব্যবহৃত যন্ত্র

কাঠের কাজ করতে হলে যে সব যন্ত্রপাতি লাগে তার নামের তালিকা ঃ
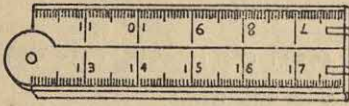
ফুট-রুল—পরিমাণ জানা হয়।
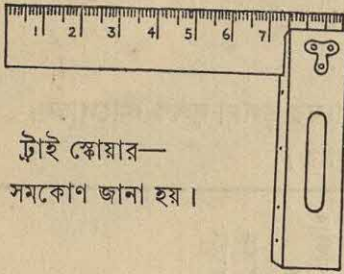
হাত করাত—তক্তা চেরাইর জন্য।

রঁ্যাদা—প্লেন করায় লাগে।

ট্রাই স্কোয়ার—
সমকোণ জানা হয়।
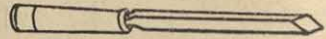
বাটালী—ছিদ্র করা, কাটা প্রভৃতির জন্য।

হাতুড়ী—বাটালীতে আঘাত করবার জন্য।

মার্কিং গজ—সমান্তরাল লাইন ধরা যায়।
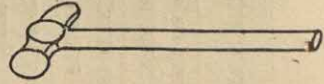
ফাইল—ঘসবার জন্য।

কম্পাস—বৃত্ত প্রভৃতি আঁকা হয়।

তুরপুণের ফলা—নীচের চিত্রের A চিহ্নিত
অংশে সংযুক্ত থাকে।

মার্কিং অল আঁচড়া—কাঠে আঁচড়
দিয়ে নেওয়া হয়।
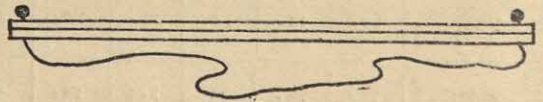
দড়ি ও লাঠি—দড়ি তুরপুণের হাতলে জড়িয়ে লাঠি ধরে ঘুরান হয়।

চক লাইন—চক মাখানো সূতো।
সোজা লম্বা চকের দাগ দেওয়ার জন্য।

সাধারণ তুরপুণ—ছিদ্র করবার জন্য।

কাঠের জোড় বা জয়েণ্ট

জোড়ের কথা বলবার আগে কাঠ কি ক'রে চেরাই করতে হয় তাও কিছু বলা দরকার।

ছোট কোনও কাঠ হাত দিয়ে চিরবার আগে করাতের দাঁতের ধার দেখে নিতে হবে
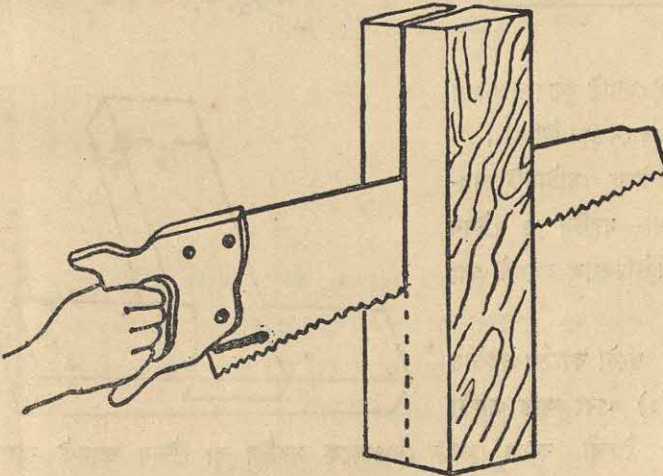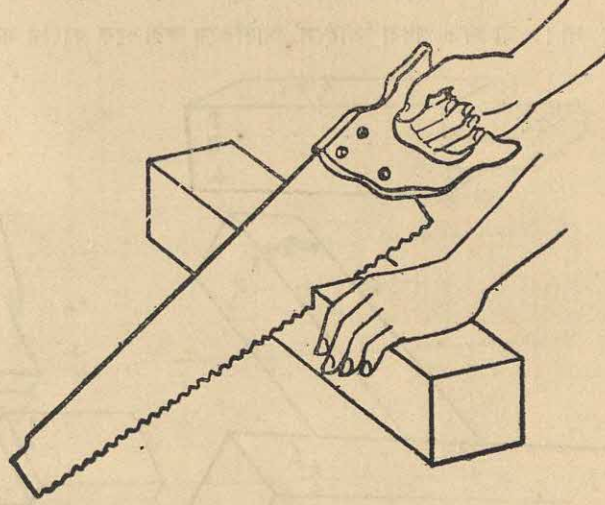
এবং ঐ দাঁতগুলো সমান ভাবে সাজানো আছে না কোথাও বেঁকে গিয়েছে তাও লক্ষ্য করতে হবে।

হাত দিয়ে ছোট কাঠ চেরাই দু' রকমে হতে পারে। ফেলে চেরাই—অর্থাৎ কাঠের টুকরাটিকে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রেখে চেরাই (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার প্রথম ছবি) এবং খাড়া অর্থাৎ কাঠটিকে ভূমির সঙ্গে লম্বভাবে রেখে চেরাই (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবি)।

ফেলে চেরাইয়ের সময় কাঠখানি বাঁ হাত অথবা পা দিয়ে ধ'রে করাতের সঙ্গে ৪৫° কোণ রেখে চেরাই করতে হয়। খাড়া চেরাইও ঐরূপ ; তবে এ ক্ষেত্রে কাঠটিকে পা দিয়ে ধরবার সুযোগ হবে না। বাঁ হাত অথবা 'ভাইসে' আটকিয়ে করাতকে কাঠের সঙ্গে ১৫° কোণ রেখে চেরাই

(২)

(১)
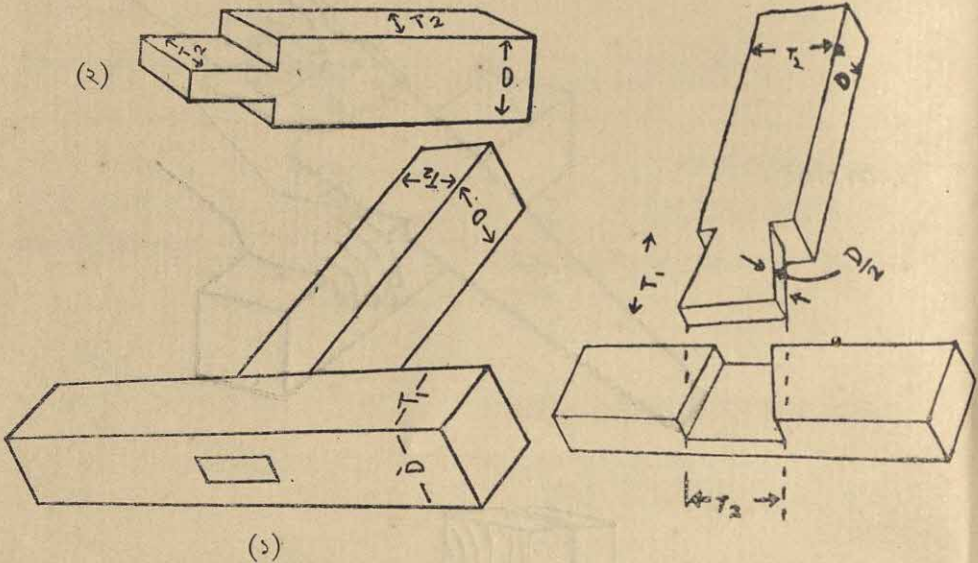
ক'রে যেতে হবে। সব কিছুই চেরাই করবার আগে চেরাইয়ের পথ বা লাইন ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত।

জোড়—জোড় বা জয়েন্টকে মোটামুটি চার-ভাগে ফেলা যেতে পারে ; যথা—মরটিস ও টেনন জয়েন্ট, ফ্রেমিং জয়েন্ট, লংগিচিউডিন্যাল জয়েন্ট এবং অবলিক জয়েন্ট।

মরটিস ও টেনন জয়েন্ট : দুটো কাঠের একটায় খাঁজ কেটে বা ছিদ্র ক'রে (১) এবং আর একটা কাঠে ঐ মাপে আল (২) তৈরী ক'রে জোড় দেওয়াকে মরটিস বা টেনন জয়েন্ট বলে (ওপরের বাঁ দিকের ছবি)।
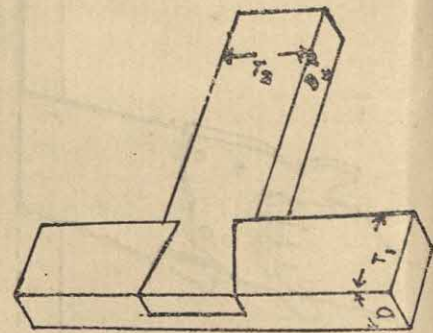
ফ্রেমিং জয়েন্ট : এই জয়েন্ট অনেক রকমের হতে পারে। তার মধ্যে 'টি (T) সেপ্' (ওপরের

ডান দিকের ছবি), 'ক্রস্ সেপ' (+), 'এল সেপ' (L), ডাভ-টেল অর্থাৎ ঘুঘুর লেজের মত জয়েণ্ট প্রভৃতি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

টেবল জয়েণ্ট ও লংগিচিউডিন্থাল জয়েণ্ট : ফুটবল খেলার গোল পোষ্ট প্রভৃতি অর্থাৎ খাড়া কোন কিছুতে জোড় দিতে হলে 'টেবল জয়েণ্ট' দরকার হয়। এই জোড়ের দুই ধারে দুটি লোহার প্লেট
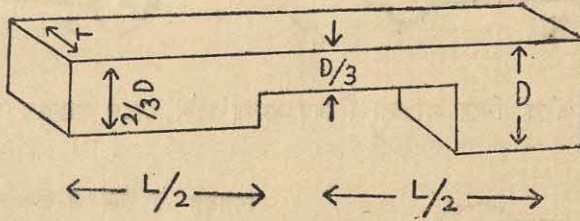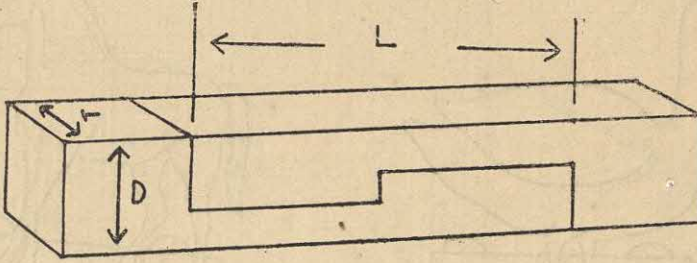
বল্টু দিয়ে এঁটে দিলে তবেই জোড়টা শক্ত হবে। কড়ি প্রভৃতি—ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল যে কাঠ থাকে, তাকে জোড় দিয়ে লম্বা করতে হলে লংগিচিউডিন্থাল জয়েণ্ট ব্যবহৃত হয়। এই জয়েণ্টের মাঝখানে উভয় পার্শ্ব থেকে দুটি খিল মারা থাকে।

অবলিক জয়েণ্ট : লংগিচিউডিন্থাল জয়েণ্ট দিয়ে যেমন লম্বার দিকে বাড়ানো হয়, অবলিক জয়েণ্ট দিয়ে তেমনি বাড়ানো হয় চওড়ার দিক্। টেবিল প্রভৃতির কাজে অনেক সময় কম চওড়া তক্তার সঙ্গে এই জোড় দিয়ে অন্য তক্তা জুড়ে দেওয়া হয়। এই জোড়কে 'গ্রুপ এণ্ড টাং' জয়েণ্টও বলে।

কাঠের খেলনা

একসুতো অর্থাৎ ১/৮ ইঞ্চি পুরু একখানা পাতলা তক্তা ও এক য' অর্থাৎ ১/৪ ইঞ্চি পুরু আর একখানা তক্তা নাও। ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, তেমনিভাবে হাঁস, ঘোড়া, হাতী
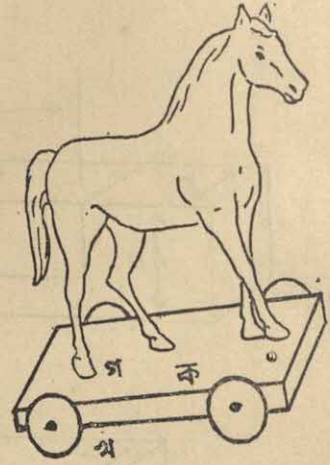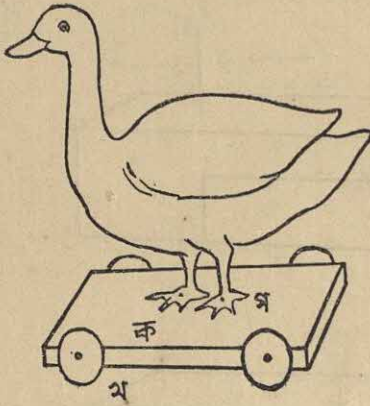
প্রভৃতি কাগজে এঁকে নিয়ে পাতলা টিনের ওপর ওটা রেখে অনুরূপ ভাবে কেটে নাও।
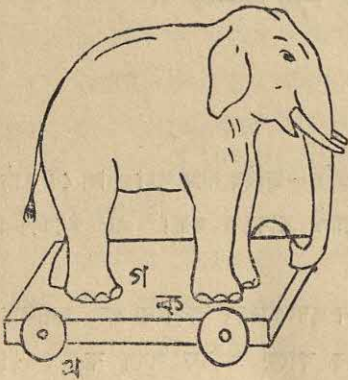
তারপর ঐ টিন ঐ একসুতো তক্তার ওপর রেখে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নাও।

এইবার বাটালী দিয়ে আস্তে আস্তে ঐ মাপে হাঁস, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি তৈরী কর। ১/৪ ইঞ্চি পুরু তক্তায় চাকা (খ) এবং ঐ সব প্রাণীর দাঁড়াবার জায়গা (ক) তৈরী করতে হবে। 'ক' তক্তার তলার দিক থেকে ছোট ছোট পেরেক মেরে (গ) ঐ সব প্রাণীর পাগুলো এঁটে দাও।

এইবার খেলনাগুলোকে রং দিয়ে নিতে হবে। রং দেবার সময় মনে রাখা দরকার, প্রাণীটির রং, ওগুলোর দাঁড়াবার জায়গার রং এবং চাকার রং সব সময়ে আলাদা হবে।

খেলনা ঘোড়ার গাড়ী

কিছু পাতলা কাঠ, খুব ছোট পেরেক, কম্পাস, বাটালী আর হাতুড়ি—মাত্র এই জিনিসগুলো দরকার হবে এই খেলনা গাড়ী করতে। টিনের একটা পাতে একবার নক্সাগুলো ক'রে নিলে তার থেকে অল্প সময়ে অনেক খেলনাই তৈরী করা যেতে পারে।
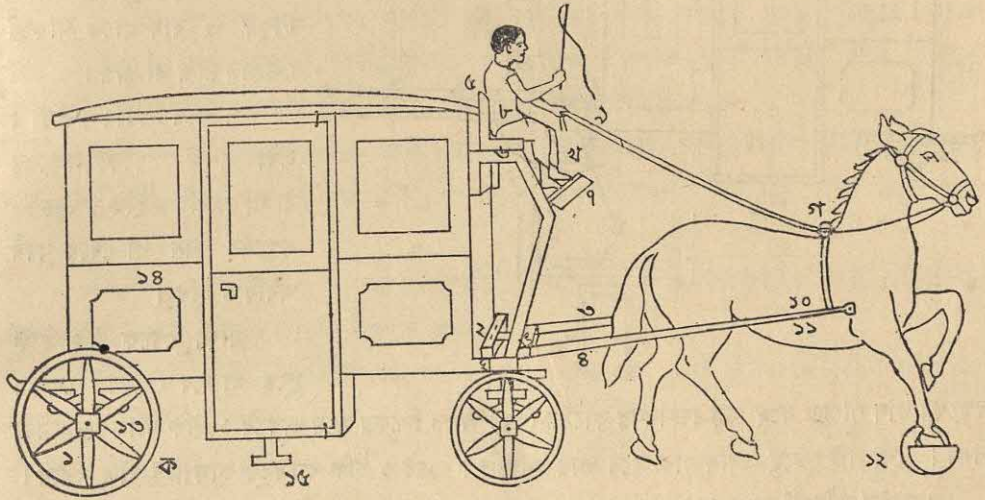
ওপরের ছবিখানি দেখ। একখানা খেলনা ঘোড়ার গাড়ীকে ক, খ, গ তিন ভাগে ধরা হয়েছে। ক হচ্ছে গাড়ী, খ চালক এবং গ হচ্ছে ঘোড়া।

প্রথমে ক অর্থাৎ গাড়ীর কথাই বলা যাক। মনে রাখতে হবে, এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই বড় কথা। এইজন্য মাপও দেওয়া গেল এই সঙ্গে :

মাটি থেকে গাড়ীর মোট উচ্চতা—৫½ ইঞ্চি।

ছাতের পাতলা কাঠ লম্বা—৫¼ ইঞ্চি, চওড়া—৩ ইঞ্চি।

সম্মুখ ও পিছনের পাতলা তক্তা চওড়া—২¼ ইঞ্চি, উচ্চ—২½ ইঞ্চি।

এই তক্তায় ঘোড়া গাড়ীতে যেমন খড়খড়ি মত থাকে তেমনি থাকবে।

এই গাড়ীতে লোহার স্প্রীংয়ের দরকার হবে না এবং কিরূপে ওটা তৈরী হবে বুঝাবার জন্য গাড়ীর স্বতন্ত্র ছবি (পরপৃষ্ঠায়) দেওয়া গেল।

দু'পাশের (দক্ষিণ ও বাম) তক্তা দু'খানির একই মাপ ও একই কাজ ; লম্বা—৮½ ইঞ্চি। দরজা ওপর থেকে পা-দানি (১৫) পর্য্যন্ত ৪½ ইঞ্চি উচ্চ। পা-দানির কাঠটি ¾ বঃ ইঞ্চি।

এইবার খ অংশ অর্থাৎ গাড়োয়ানের ব্যবস্থা : (৫) ঠেস দেওয়ার কাঠ, ৫,৬ কাঠের আসন, ৭ টিনের বাঁকানো পা রাখবার স্থান।
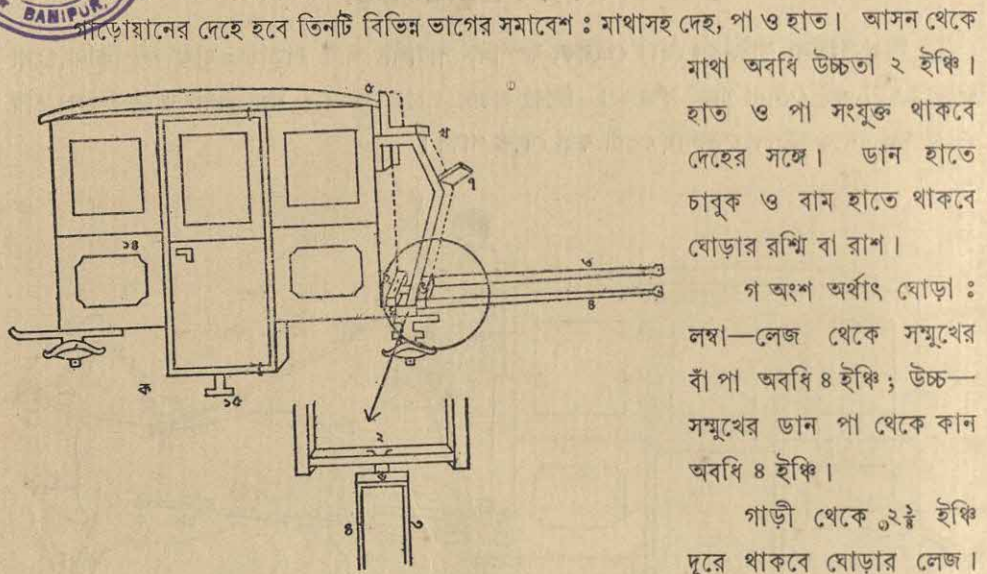
গাড়োয়ানের দেহে হবে তিনটি বিভিন্ন ভাগের সমাবেশ : মাথাসহ দেহ, পা ও হাত। আসন থেকে মাথা অবধি উচ্চতা ২ ইঞ্চি। হাত ও পা সংযুক্ত থাকবে দেহের সঙ্গে। ডান হাতে চাবুক ও বাম হাতে থাকবে ঘোড়ার রশ্মি বা রাশ।

গ অংশ অর্থাৎ ঘোড়া : লম্বা—লেজ থেকে সম্মুখের বাঁ পা অবধি ৪ ইঞ্চি ; উচ্চ—সম্মুখের ডান পা থেকে কান অবধি ৪ ইঞ্চি।

গাড়ী থেকে ২½ ইঞ্চি দূরে থাকবে ঘোড়ার লেজ। সম্মুখের ডান পায়ের সঙ্গে অর্দ্ধ চক্রাকার কাঠের (১২) অপর দিকের সঙ্গে থাকবে ১ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি চাকা। ঘোড়াটি ছুটছে এমনি ধারা হবে তার আকৃতি। এই ১ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত চাকাটিই মাত্র ঘুরবে।

অন্যান্য খুটিনাটি অংশ :

চাকা—পিছনের চাকার ব্যাস ৩½ ইঞ্চি, সম্মুখের চাকার ব্যাস ২½ ইঞ্চি, ১ চিহ্নিত স্থানে লোহার কাঠি দিয়ে উভয় চাকা সংযুক্ত থাকবে। সম্মুখের ঘ চিহ্নিত স্থানে একটা চৌকা কাঠ পেরেক দিয়ে উভয় দিকে সংযুক্ত থাকবে। এটাকে 'ধুরো' বলা হয়। এই ধুরোর (২) চিহ্নিত স্থানে একটা লোহার তার ঘুরতে পারে এমন ভাবে ঙ কাঠটা আটকে দিতে হবে। ৩, ৪ দুইটি কাঠের সরু বোম্। ঐ দুইটি ঘোড়ার উভয় দিক্ দিয়ে গিয়ে ১০, ১১ চিহ্নিত স্থানে সরু পেরেক দিয়ে আঁটা থাকবে। (৯) রশ্মি ঘোড়ার পিঠে গ স্থানে একটা আংটার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। গাড়ীর মধ্যে অয়েল ক্লথ দিয়ে দুটো গদি হবে। আরোহীর পা রাখবার স্থান—অর্থাৎ গাড়ীর তলার মাঝখানটা করতে হবে টিন দিয়ে। গাড়ীর দরজার ওপর-নীচে এমন দুটো খিল থাকবে যাতে হাণ্ডেল ধ'রে দরজাটা খোলা বা বন্ধ করা যায়।

তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে যেখানে যে ভাবে রং দেওয়া হয় তাই দিয়ে নিতে হবে।

অবসর সময়ে তোমরা নিজেরা এই খেলনা গাড়ীটি তৈরী করতে চেষ্টা করো। ভাই-বোনদের খেলনা তৈরীই যে তাতে হবে তা নয়, এর থেকে তোমরা একটা আনন্দও পাবে—সেটা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ।

গাড়ী-চড়বড়ি

এর আগে 'স্বদেশী খেলনা' তৈরী সম্বন্ধে তোমাদের অনেক কিছু বলেছি। এবার আরও একটা স্বদেশী খেলনার কথা বলব। নিজেরা ওটা তৈরী করতে চেষ্টা করো। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, কেবল খেলনাই নয়—সব কিছু নিজে তৈরী করতে শিখবার যুগ এসেছে। এর মধ্যে মান-অপমানের প্রশ্ন যেন না ওঠে। নিজে কিছু তৈরী করবার মধ্যে আনন্দও আছে খুব। তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ীতে জমি আছে, তারা ছোট একটা জায়গা ঘিরে সেখানে শাক-সব্জী, ফুল প্রভৃতির বাগান ক'রে দেখতে পার কত আনন্দ এইসব কাজে।

যাক্। কথা হচ্ছিল খেলনা তৈরী নিয়ে। হ্যাঁ, এবার যে খেলনাটির কথা বলব এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধি আছে খুব—জাপানী খেলনার চেয়ে এটা কিছুমাত্র নিকৃষ্ট নয় অথচ তৈরী করা কত সোজা!

খেলনাটার নাম দেওয়া যাক—'গাড়ী-চড়বড়ি'। একখানা ছু'চাকার কাঠের গাড়ী দড়ি দিয়ে টানবে আর আপনা আপনি চড়বড়ি বাজতে থাকবে।

ছবি দেখলে তৈরী করবার উপায়টা সহজে বুঝতে পারবে। ছোট ছুটো চাকা চাই (ক, খ)—কাঠের, মাটির বা টিনের—যা দিয়ে ইচ্ছে ওটা তৈরী করা যেতে পারে। ঙ হচ্ছে ওর ধুরো। এই ধুরোটা যেন গ, ঘ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বেশ ঘুরতে পারে। জ একটি পাকানো দড়ি। দড়িটির পাক যাতে না খোলে অথবা যাতে খুব পাকিয়ে না যায়, সেজন্য ওর পাকের মধ্যে
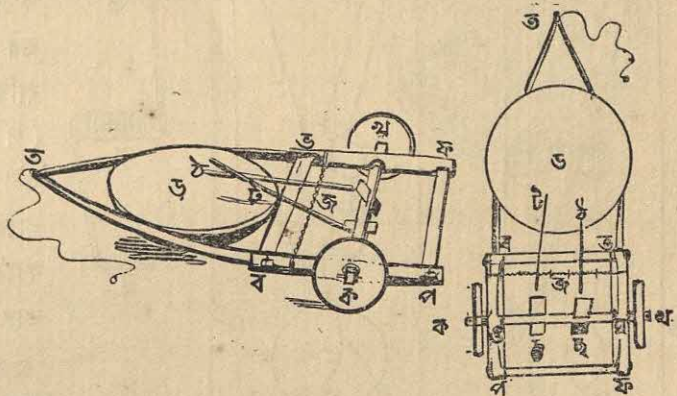
কয়েকটি ছোট কাঠি পুরে রাখলে ভাল হয়। এই দড়ির মধ্যেই বড় ছুটো কাঠ ট, ঠ পুরে দাও। আর একটা কথা বলা হয় নি। ঘ ধুরোর সঙ্গে ছুটো চ্যাপ্টা (টিনের, কাঠের বা বাঁশের) ছোট পাত চ, ছ লাগাতে হবে। ওর একটা থাকবে মাটির সঙ্গে লম্বা বা খাড়া ভাবে এবং আর একটা থাকবে সমান্তরাল বা শোওয়া ভাবে। গাড়ীর চাকা ঘুরবার সময় ওর একটা উঠবে এবং আর একটা নামবে। তার ফলে ট, ঠ কাঠি ছুটো পর পর তাড়াতাড়ি ওঠা-নামা করবে।

এতে ড চড়বড়িটিতে ঐ কাঠি দুটির চটাপট শব্দ হবে। এই চড়বড়িতে পাতলা কোনও চামড়া কাঁচা থাকতে লাগিয়ে রৌদ্রে দিয়ে অথবা সুপারীর খোলার বাকল শক্ত ক'রে আঠা দিয়ে এঁটে নিলে চলতে পারে। বাজারে যারা এই খেলনা বিক্রী করে, তারা ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর পাকস্থলীর পাতলা চামড়া চুণ দিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কাঁচা কলাইয়ের আঠা দিয়ে ওটা এঁটে নেয়।

গাড়ীটাকে শক্ত করবার জন্য প ফ ও ব ভ দুটি বন্ধনী সংযুক্ত রাখা দরকার। খেলনাটি তৈরী হয়ে গেলে গাড়ীর মাথায় (ত স্থানে) একটা দড়ি বেঁধে টানলে আপনা আপনি চড়বড়িটি বাজতে আরম্ভ করবে।

কাপড় শুকোবার ক্লিপ বা আংটা

তিন কি সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া ও অনুরূপ পুরু ছোট ছোট দু'খানি কাঠ (ক) ও (খ)—ছবির অনুরূপ কেটে নাও।
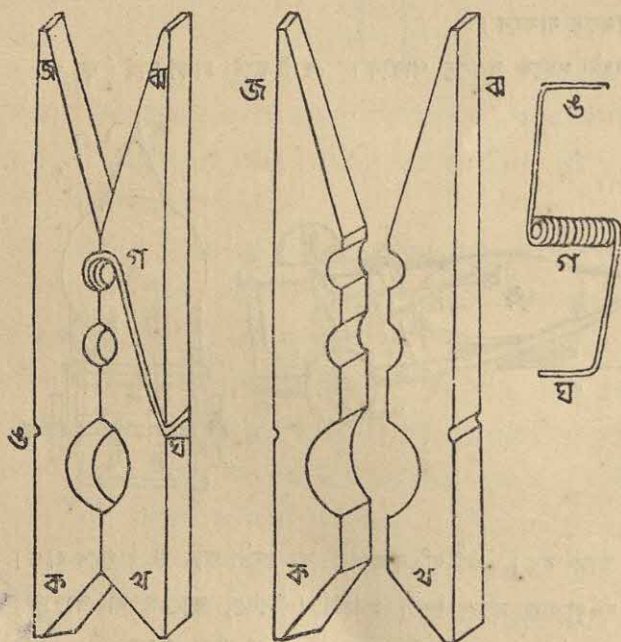
তারপর একটা তার নাও। এই তারের দুই মুখ সমকোণ ক'রে ভাঁজ ক'রে নাও (ঙ, ঘ)। ওর মাঝখানটার তার বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে স্প্রীং-এর মত ক'রে নাও (গ)। একটা লোহার কাঠিতে ওটা জড়িয়েও স্প্রীং করা যেতে পারে। আংটাটির ছিদ্র অথবা ঐ কাঠের উচ্চতা অনুযায়ী, জড়ান তার বা স্প্রীংটির দৈর্ঘ্য হবে।

এখন ঐ স্প্রীংটিকে লম্বভাবে রেখে ওর দু'দিক্ দিয়ে ক ও খ কাঠ লাগাও এবং স্প্রীংটির ঘ ও ঙ প্রান্ত ক ও খ উভয় কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে দাও।

এইবার ক খ কাঠের জ, ঝ স্থানে আঙ্গুল দিয়ে টিপলে ক, খ স্থানে ফাঁক হয়ে ক্লীপ বা আংটার কাজ করবে।

শিমুল-কাঁটার রবার ষ্ট্যাম্প

কথাটা শোনাচ্ছে সোনার পাথরের বাটি বা কাঁঠালের আমসত্তের মতই অদ্ভুত !

কিন্তু আমি এখানে এই কথাই বলতে চাইছি যে, রবার ষ্ট্যাম্প বলতে আমরা যা বুঝি,—ঠিক সেই রকম জিনিসই তৈরী করা যেতে পারে শিমুলের কাঁটা দিয়ে।

রবার ষ্ট্যাম্প তোমরা দেখেছ। ওটা তৈরী হয় রবারের ওপর। পিতল খুঁড়েও অনেক শীল-মোহর তৈরী করা হয়।

তোমরা অনেকেই কোন না কোন সমিতির সভ্য। তোমাদের হয়ত লাইব্রেরী আছে—কত বই আছে। কাজেই শীল-মোহরের দরকার বোধ কর তোমরা সকলেই।

হাঁ, নিজেরাই তোমরা ওটা তৈরী ক'রে নিতে পার এবং সেটা রবার ষ্ট্যাম্পের চেয়ে কিছুমাত্র খারাপ হবে না।

শিমুলগাছ তোমরা দেখেছ। এই শিমুলগাছের গুঁড়ির বাকল থেকে চওড়া ও মোটা দেখে দা দিয়ে একটা কি একসঙ্গে দুটো কাঁটা তুলে নাও। ঐ কাঁটার নীচের দিকের কাঁচা বাকলটি ভাল ক'রে তুলে ফেলে পাথরের ওপর বেশ ক'রে ঘসে নাও। তারপর যে সাইজের ষ্ট্যাম্প হবে, সেই সাইজ মত কাঁটাটি কেটে নাও এবং তদনুসারে পাথরে একটু জল দিয়ে চন্দনকাঠ ঘসার মত ওটা সাইজ মত ঘসে নাও।

এইবার একটা ধারাল নরুণ বা খুব সূক্ষ্মাগ্র ছুরির দরকার। কাঁটার উল্টো পিঠে—যেখানটা ঘসে সমতল করা হয়েছে, ঐ জায়গায় পেন্সিল দিয়ে নক্সা কেটে নিয়ে নরুণ বা ছুরি দিয়ে ঐ নক্সা অনুযায়ী কাঠ খুঁড়ে নিতে হবে। কাঠটা শক্ত মনে হলে ওটাকে কিছু সময় জলে ভিজিয়ে রাখলেই বেশ নরম হবে।

খোদাই করবার সময় অক্ষরগুলো উল্টো ক'রে লিখতে হবে। সেজন্য শ্লেটে অক্ষরগুলো লিখে নিয়ে হাতের তালুতে তার ছাপ নিয়ে দেখে নিতে পার—কোন্ অক্ষরের উল্টো রূপ কিরূপ হবে। একটা গোল আলু দু'ভাগ ক'রে কেটে তার ওপরও নক্সা বা অক্ষরগুলো লিখে নিয়ে কালী মাখিয়ে ছাপ দিলে উল্টো অক্ষর ও নক্সা পাওয়া যাবে।

অক্ষর বা নক্সা ঐ কাঠের ওপর গর্ত ক'রে খুঁড়ে দিলে ষ্ট্যাম্পে ওগুলোর সাদা দাগ হবে এবং অক্ষরগুলো উঁচু ক'রে তুলে সমতলটা খুঁড়ে সমান ক'রে দিলে, ছাপে কালীর লেখা হবে।

কাঁটাটাকে কেটে ধরবার মত ক'রে নাও। এটা হবে ষ্ট্যাম্পের হাণ্ডেল। তারপর রবার ষ্ট্যাম্পের প্যাডে চাপ দিয়ে কাগজের ওপর মারলেই পরিষ্কার ষ্ট্যাম্পের ছাপ পড়ে যাবে।

পেরিস্কোপ

ফুটবলের মাঠে খুব ভীড় হলে অনেকে পেরিস্কোপের সাহায্যে বাইরে থেকেও খেলা দেখে। এই পেরিস্কোপ তৈরী করা খুব কঠিন নয়।

পাতলা কাঠের বা কাগজের একটা চৌকা ও লম্বা বাক্স তৈরী কর (ক)। ঐ বাক্সের গ স্থানে ৪৫° ডিগ্রী কোণ ক'রে একখানি আয়না বসাও। বাক্সটির নীচে ঘ স্থানেও অনুরূপ আর একখানি আয়না ৪৫° কোণ ক'রে বসাও। বাক্সের খ স্থানে থাকবে ফাঁক। ওখান দিয়ে বাইরের বিষয়বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়বে (গ) কাচের ওপর। এখান থেকে সেটা আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে হয়ে পড়বে গিয়ে (ঘ) কাচের ওপর। বাক্সের (ঙ) স্থানে রাখতে হবে ফাঁক ; এইটাই চোখ দিয়ে দেখবার পথ।
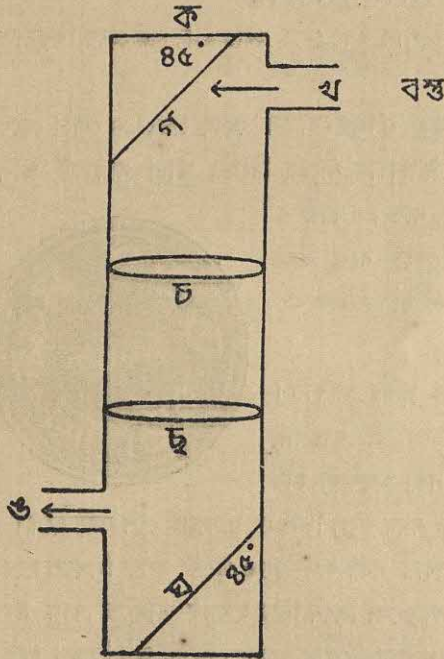
দেখবার জিনিসটা যদি বেশী দূরে থাকে এবং ওটাকে যদি খুব পরিষ্কার দেখবার দরকার হয়, তা'হলে বাক্সের (চ) ও (ছ) স্থানে দুইখানি ভাল লেন্স্ বসিয়ে নেওয়া দরকার।

সাবমেরিণ যখন জলের নীচে দিয়ে চলে, তখন ওপরে কি হচ্ছে, শত্রু ধাওয়া করছে কিনা, এই সব জানবার জন্য মধ্যে মধ্যে জলের ওপর পেরিস্কোপ তুলে দেখা হয়।

আরজমন্দবানু বেগম অর্থাৎ মমতাজের সমাধির ওপর শাজাহান যে স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে রেখে গেছেন, তা স্থাপত্যশিল্পের এক অনুপম কীর্ত্তি। ১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ একুশ বছর লেগেছিল এই তাজমহল নির্ম্মাণ করতে। এই অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণে অধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন শিল্পী মুকর রহমৎ খাঁ ও আবদুল করিম।

তাজ-সৌধের পিছনে ছিল সম্রাট্ শাজাহানের অপূর্ব্ব পত্নী-প্রেম। মমতাজ বেগমকে তিনি আন্তরিক ভালবাসতেন ; তাই তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মিত হয় অতুলনীয় এই তাজমহল।

কিন্তু একমাত্র মমতাজ-প্রীতিই কি সম্রাটের কল্পনায় তাজমহলের ছবি ধরা দিয়েছিল ? তা নয়। সাজাহান ছিলেন একজন খুব উঁচুদরের শিল্পী। প্রেমের তুলি দিয়ে তিনি তাঁর কল্পনার রঙে এঁকে-ছিলেন তাজমহল। তাই ত তাজমহল এত সুন্দর!

এখন আমি বাংলার একজন শাজাহানের কথা বলব। বাইরের দিক থেকে কিন্তু তাজমহলের শাজাহানের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। ইতিহাসে এঁর নাম নেই—কোন কবি এঁর তাজ দেখে কবিতা লেখেন নি—এমন কি অধিকাংশ বাঙ্গালীই এই বাংলার শাজাহানের নাম পর্য্যন্তও শোনেন নি!

তবুও আমি তাঁর কথা আজ ভারত-সম্রাট্ শাজাহানের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলছি এই জন্যে যে, যে প্রেরণায় সম্রাট্ শাজাহান তাজমহল রচনা করেছিলেন—বাংলার শাজাহান শরাজান মিয়াও ঠিক সেই প্রেরণাই পেয়েছিলেন অন্তরে।

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। ফরিদপুর জেলার বনমালদিয়া গ্রামে ছিল শরওয়ারজানের বা শরাজানের বাসভূমি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। শরাজান একজন উচ্চবংশীয় মুসলমানকন্যাকে বিবাহ করেন। কন্যার পিত্রালয়ে পাকা কোঠাবাড়ী ছিল, কিন্তু শরাজানের বাড়ীতে ছিল চালাঘর।

এই চালাঘর দেখে নাকি শরাজানের নবপরিণীতা স্ত্রী দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'আমার বাপের বাড়ীতে কত গণ্যমান্য লোক আসেন, কিন্তু এখানে ভদ্রলোকের মুখও দেখা যায় না।'

তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য শরাজানের প্রবল ইচ্ছা হ'ল—যেমন হয়েছিল দিল্লীশ্বর
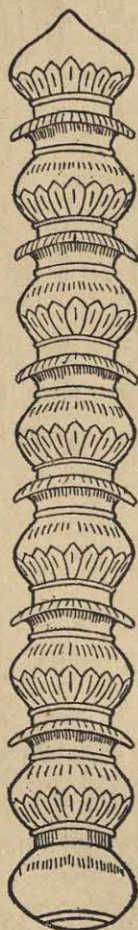
রুয়োর গৌড়ার ফুল

ঘরের খাম বা খুঁটি

প্রত্যেক চালের সংযোগ-স্থলের 'কোণ'
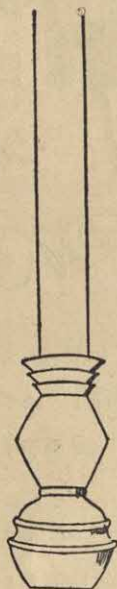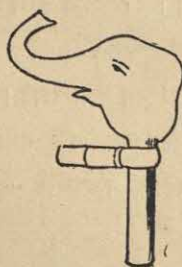
এরূপ কাঠের হাতী-মুখের সঙ্গে 'ডাক'গুলো আটকানো

শীতলপাটির ওপর কাঠের ফুল

শাজাহানের। শরাজান স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার বাপের বাড়ীতে কোঠাঘর, আর আমার বাড়ীতে চালাঘর ; কিন্তু দেখবে, শরাজান মিয়া তার চালাঘরেই দেশের সমস্ত গুণী-মানী আর বড়লোকদের টেনে আনবে।'

শরাজান মিয়া ডাকলেন তখনকার দিনের ওস্তাদ রাজলোচন ঘরামীকে। ওস্তাদ কিন্তু শরাজানের কল্পনা শুনে পিছিয়ে গেলেন ভঁয়ে। তখন তাঁরই শিষ্য মহিমচন্দ্র ঘরামী নিলেন— শরাজানের কল্পনার তাজমহল—একখানি খড়োঘর নির্ম্মাণের ভার। দেশের প্রসিদ্ধ ঘরামীদের ডাকিয়ে তাদের করতে দেওয়া হ'ল বাঁশের 'রুয়ো'। যে সব ঘরামী চট্‌পট্ কাজ দেখিয়ে রোজ পনের-কুড়িটা রুয়ো তৈরী করল, মহিম তাদের দিলেন বিদায়; আর যে সব ঘারামী সারাদিন ব'সে একটি মাত্র রুয়ো তৈরী করছে, কাজে বহাল করলেন তাদেরই। এইভাবে বাঁশ দিয়ে তৈরী হ'ল 'রুয়ো', চটা, ফুরশী এই সব। মহিম প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করবার জন্য তার ওপর দিয়ে একগাছি রেশমী সুতো টেনে নিয়ে আসতেন। যদি কোথাও সুতো আটকে যেত সে জিনিস বাতিল করা হ'ত।
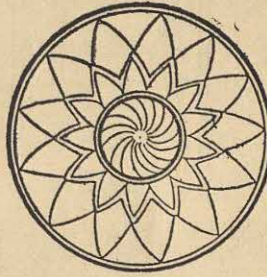
শীতলপাটির ওপর রঙিন কাঠের ফুল

এমনি ভাবে পুরো তিন বছর ধ'রে তৈরী হ'ল শরাজান মিয়ার ঘরের সরঞ্জাম। তারপর তৈরী হ'ল ঘর। ঘরখানি ৩৫ ফুট লম্বা, ৩০ ফুট চওড়া এবং ২৪ ফুট খাড়াই। এর প্রত্যেকটি রুয়ো, ছাটন এবং ফুরশী সামঞ্জস্য সহকারে সাজানো হ'ল, ঐগুলোর ব্যবধান হ'ল সুনিয়ন্ত্রিত। এই চারিচালা-বিশিষ্ট ঘরখানা ছাওয়া হ'ল উলুছন দিয়ে। প্রত্যেকটি বাঁশের সরঞ্জামের শ্রী ফুটিয়ে তোলা হ'ল বেতের সুন্দর কারুকার্য্যে। সাতৈর নামক স্থানের সুবিখ্যাত শীতলপাটি দিয়ে চালের নীচের দিকের ছাউনি দেওয়া হ'ল।

'ফুরশী' ও ছাটনের বিভিন্ন নক্সার বেতের বাঁধন

তারপর শিল্পী 'মিনাপাত' আর 'অভ্র' দিয়ে ঘরের ভেতর-দিক্‌টা দিলেন মুড়ে। তার ফলে ঘরে একটিমাত্র ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি জ্বাললে সমস্ত ঘরটাই প্রতিবিম্বিত হয়ে আলোকিত হ'ত। ঘরখানি তৈরী করতে অনুমান ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

শরাজানের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।

কত কত বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর এই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত খড়ো ঘরখানি দেখবার জন্য ছুটে গিয়েছেন সেখানে। বাংলার লাটসাহেব পর্য্যন্ত শরাজানের খড়ো ঘরে উপস্থিত হয়েছেন।

ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় ক'রে কোঠাবাড়ী তৈরী ত কত লোকই ক'রে থাকেন, কিন্তু সে বাড়ী
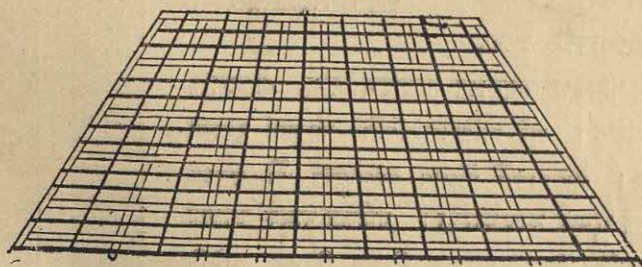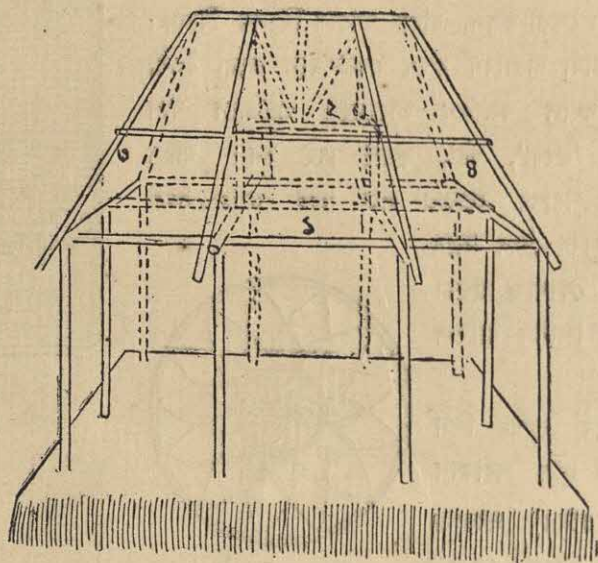
(ওপরে) চারচালা বা চৌরিঘর (নীচে) চালের নীচের দিক

দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কি কেউ ছুটে যায়? শরাজানের মনের মধ্যে যে চারু শিল্পের উদয় হয়েছিল, মহিম ঘরামীর কার্য্য-দক্ষতায় সেই শিল্প পেয়েছিল বাইরের রূপ—তার প্রকাশভঙ্গী হয়েছিল অপূর্ব্ব।

খড়ের চালাঘরের কথা শুনে অনেকে নাক সিঁটকাতে পারেন ; কিন্তু এই খড়ের ঘরেই একদিন ছিল বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। বাংলার এই ঘর রচনার রীতি তার একান্তই নিজস্ব।

আজ বাংলার শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দুই-এক পুরুষ পূর্ব্বেও তাঁদের অধিকাংশই পল্লীগ্রামে খড়ো ঘরে বাস করতেন।

আজ যে অট্টালিকা-সমাকীর্ণ কলকতা সহর আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে এর পাকা বাড়ীর সংখ্যা ছিল মাত্র আটখানি! আর কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা ছিল আট হাজার। ক্রমোন্নতিতে সেই আদি কলকাতা বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

খড়ের ঘর শীতকালে যেমন গরম থাকে গ্রীষ্মকালে এগুলো তেমনি দেয় শীতল ছায়া।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জায়গায় নদীর ভাঙ্গনের ভয়ে লোকে ইচ্ছা ক'রেই খড়ের ঘর তৈরী করতেন। এই সব খড়ের ঘরে তাঁদের শিল্পানুরাগ যথেষ্টরূপে প্রকাশ পেত। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে আজও সুদৃশ্য খড়ের খর দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় এই সব ঘরের সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে অনেক বিবৃতি আছে। 'মলুয়া' গীতিকায় চাঁদ বিনোদের ঘর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"কামলার কাম—বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভাল কইর‍্যা বান্ধে বাড়ী স্যত্যা নদীর কানে॥
আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভাল কইর‍্যা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর॥
শীতলপাটি দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনোহরা॥
ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম।
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান॥
মাছুয়া পক্ষীর পাখ সাজুয়া বানায়।
কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কর্ণি কাটায়॥"

শীতলপাটি দিয়ে যে ঘরে বেড়া দেওয়া, মাছুয়া পক্ষীর পাখা দিয়ে যার সাজ তৈরী, পুকুরের জলের ওপর যার প্রতিবিম্ব পড়ে, সে ঘরের শ্রীর কথা সহরের ধূলি-ধূসরিত বুকে ইটের ঘরে ব'সে আমরা বুঝতে পারব না।

একদিন বাংলার আটচালা, চৌচালা চণ্ডীমণ্ডপ এই উলুছনের ছাউনি দিয়েই তৈরী হ'ত। প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী-প্রণেতা আবুল ফজল বাংলার এই ঘরগুলোর বিশেষ প্রশংসা ক'রে গেছেন! বাংলায় তেমন ঘর তৈরী করার শিল্পী আর আছেন কি?

বাঁশের খেলনা

সুদর্শন চক্র

এই খেলনা তৈরী করতে বাঁশের অথবা নলগাছের নল চাই। নলটা আটহাত লম্বা হলেই চলবে। এর গোড়ার অর্থাৎ নীচের দিকটায় থাকবে একটা গিট (ক)। ঐ নলের মুখ (গ) থেকে আঙ্গুল দুই-তিন নীচে একটা জায়গা খানিকটা কেটে নিতে হবে (খ)।
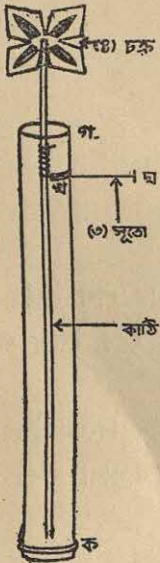
তারপর পাতলা পিচবোর্ড বা পোষ্টকার্ড অথবা খুব পাতলা টিন দিয়ে একটা চক্রের মত (৪) তৈরী কর। ঐ চক্রটা থাকবে একটা কাঠির মাথায় এমনভাবে আঁটা, যাতে ওটা ওপরের দিকে উঠে বা খুলে যেতে না পারে। এখন ঐ কাঠিটাকে নলের ভিতর পুরে দাও। এইবার ঐ কাঠিটায় একটা শক্ত স্থতো (৩) বেঁধে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঠির সঙ্গে জড়িয়ে স্থতোটাকে নলের কাটা অংশ (খ) দিয়ে বের ক'রে আন। স্থতোর প্রান্তে থাকবে একটা ছোট্ট কাঠি (ঘ) বাঁধা। এখন ঐ কাঠি ধ'রে আস্তে টান দিয়ে ছেড়ে দিলেই স্থতোটার পাক খুলে আবার আপনা থেকেই জড়িয়ে যাবে। এই রকম করলে ওপরের চক্রটাও বেশ ঘুরতে থাকবে। চক্রটাকে ইচ্ছামত বিবিধ রং-চং ক'রে স্থশ্রী ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

পিংপং বা দোয়েল বাঁশী

সরু বাঁশের বা নলের আধহাত লম্বা একটা নল চাই। নলটার নাম দেওয়া হোক 'ক'। এই 'ক' নলের একপ্রান্ত 'গ' মুখে বাঁশীর মত চেপ্টা ক'রে কেটে এমনভাবে

একটা কাঠ কি বাঁশ পুরে দিতে হবে যে, এই মুখে ফুঁ দিলে এক আঙ্গুল ওপরের 'খ' কাটা অংশ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসতে পারে।

এইবার একটা কাঠির (ঘ) মাথায় নেকরা জড়িয়ে ঐ নেকরায় রেড়ীর বা সরষের তেল দিয়ে কাঠির 'ঙ' স্থান ধ'রে ফুটবল পাম্প করার মত একবার সামনে ধাক্কা দিতে ও একবার টেনে আনতে হবে। এই সময়ে বাঁশীটা এক হাত দিয়ে ধরতে হবে মুখে এবং ফুঁ দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি ক'রে 'ঙ' কাঠিটা উঠা-নামা করলে পিংপং আওয়াজ হবে এবং ওটা খুব আস্তে আস্তে উঠা-নামা করলে দোয়েলের মত শিস্ দেবে ঐ বাঁশী।

পিং পং বা দোয়েল বাঁশী
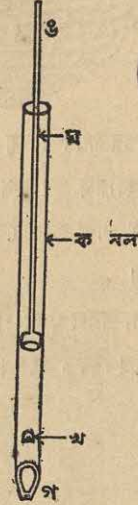
কট্‌কটে ব্যাং

মাটির তৈরী একটা ব্যাং (ক)-এর মুখের ছিদ্রের সঙ্গে ঘোড়ার লেজের একটা চুলের দুই প্রান্ত (খ) একসঙ্গে বেঁধে অপর দিক্‌টা কাঠির (গ) সঙ্গে এমন ক'রে বেঁধে দিতে হবে যে, ঐ চুলের ঘুরান বাঁধনটা বেশ ঘুরতে পারে। কাঠিটার ঐ জায়গায় খানিকটা রজন কি ধূপ গলিয়ে মাখিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। তারপর কাঠিটার 'ঘ' স্থানে ধ'রে ঘুরালেই বেশ কট্‌কট্ শব্দ হবে!

কটকটে ব্যাং

মাটি দিয়ে ব্যাং তৈরী করতে না পারলে, খানিকটা এঁটেল মাটি চটকে একটা মার্বেলের মত ক'রে তার এধার-ওধার ছিদ্র ক'রে উনুনের আগুনে পুড়িয়ে নিলেও চলতে পারে।

মনে রাখতে হবে, সব খেলনারই বড় কথা বাইরের কারুকার্য্য দেখিয়ে অপরকে মুগ্ধ করা। সেইজন্য মাটির ঢেলার চেয়ে কাঁচা মাটি দিয়ে ব্যাং তৈরী ক'রে তার মুখে ছিদ্র রেখে ওটাকে পুড়িয়ে নিয়ে পরে রং-চং ক'রে নেওয়াই ভাল।
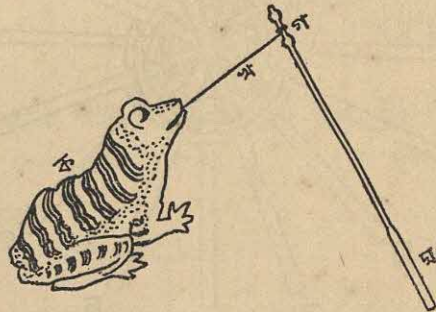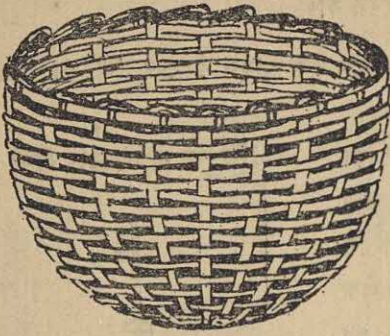
ঝুড়ি

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি করা হয়। সাধারণ বাঁশ থেকেও ঝুড়ি বা চুবড়ী তৈরী হয়; কিন্তু সেগুলোর স্থায়িত্ব খুব রুম। অবশ্য ভাল পাকা বাঁশ বেশ ক'রে 'পানেট'—অর্থাৎ জলে ভিজিয়ে রেখে তার থেকে সরু সরু বেতি তুলে তা দিয়ে জেলেদের স্থায়ী ও সুন্দর মাছের ঝাঁকা প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

ভাল, সরল এবং পাকা 'জাওয়া' বাঁশের কঞ্চি কেটে দুই-এক রাত্রি জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ঐ কঞ্চি চিরে নিতে হবে। চিরবার সময় কঞ্চিটার মোটা অনুসারে চার বা ছয় ফালি দেওয়ার প্রয়োজন।
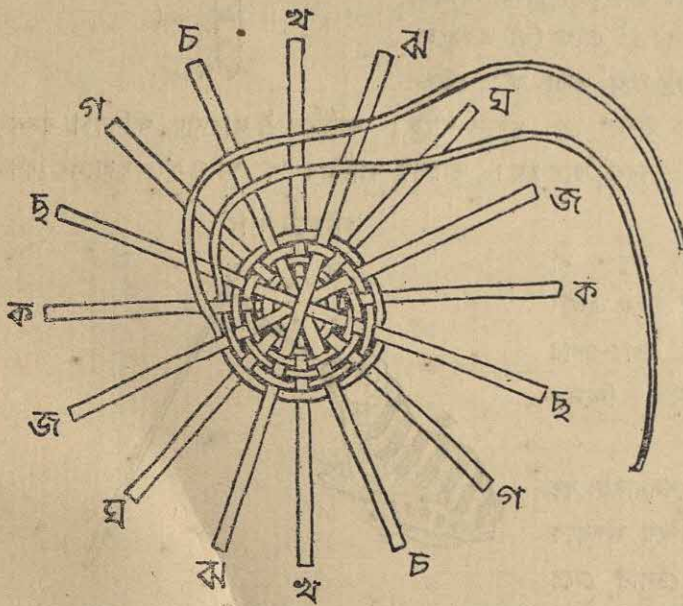
তারপর ঝুড়ির আকার অনুসারে আবার দেড়হাত বা দু'হাত লম্বা 'থিউটি' বা 'জাসি' তৈরী ক'রে নিতে হবে।

জো : একটা দড়ি ধ'রে মাটিতে বৃত্ত এঁকে নাও। এই বৃত্তের ব্যাস ধর—দেড় হাত। 'থিউটি'ও দেড়হাত লম্বা ক'রে নিতে হবে। 'বেতি' হবে কঞ্চির লম্বা অনুসারে দশ-পনের হাত লম্বা। 'থিউটি' হচ্ছে ঝুড়ির ব্যাস, আর 'বেতি' হচ্ছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে লম্বা কঞ্চির ফালিটা দিয়ে বুনানী করা হয়, সেইটা। পূর্ব্ব হতে মাটিতে বৃত্ত করে নেওয়ার উদ্দেশ্য—তাতে ঝুড়ির কেন্দ্র ধরা সহজ হয় এবং থিউটিগুলোও ছোট-বড় হতে পারে না; তার ফলে ঝুড়িটি বেশ গোল হয়।

প্রথমে ক, খ, গ, ঘ চার জোড়া 'থিউটি' নাও। 'ক' জোড়া থিউটির ওপরে খ, গ, ঘ'র নীচে দিয়ে একটা বেতি ঢুকিয়ে ওপর-নীচে ক'রে বুনে যাও! তিন-চার আঙ্গুল বুনার পর থিউটিগুলো উলটিয়ে দাও। তারপর আরও চারজোড়া থিউটি চ, ছ, জ, ঝ—ঐ পূর্ব্বকার ক, খ, গ, ঘ থিউটির পরস্পর দূরত্ব বা ফাঁকগুলোর মধ্যে পুরে নাও।

এইবার ঝুড়ির পিঠের অর্থাৎ সবুজ দিক্‌টা তোমার বুকের দিকে রেখে এবং ঝুড়ির খোল সম্মুখে রেখে ঝুড়িটিকে বামপাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানহাতে দুইটি লম্বা বেতি নিয়ে থিউটিগুলোর সঙ্গে ওপর-নীচ ক'রে বুনে যাও।

বুনানী শেষ হলে একটা বাঁশের কাবারী দিয়ে চাক তৈরী করে ঐ ঝুড়ির মুখে গোল ক'রে বেঁধে দাও। মুখের ঐ গোল কাবারীটায় গোটা কয়েক আল্‌গা বাঁধন দিয়ে থিউটির উঁচু মাথাগুলো ক্রমান্বয়ে ডানদিকে ভেঙ্গে দড়ি বা বেতের শক্ত বাঁধন দিয়ে যাও।

ভাঙ্গা জোর ঝুড়ি ঃ 'জো' বুনবার সময় গোড়ার একটা বেতি একসঙ্গে কয়েক আঙ্গুল বুনার
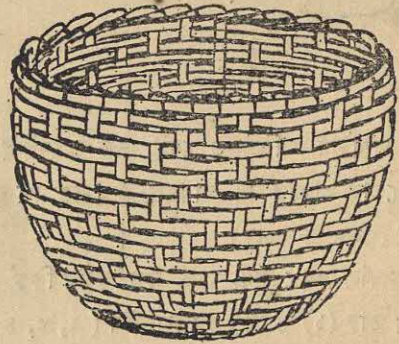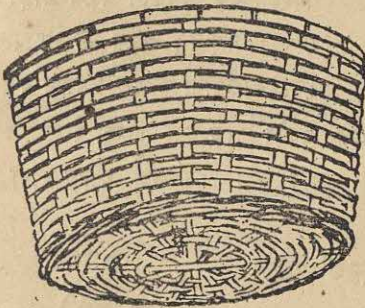
পর দুটি ক'রে থিউটি তুলে ওপর-নীচে ঐ একটা বেতি দিয়ে বুনে যাও। একে ভাঙ্গা জোর ঝুড়ি বলে। এই ঝুড়ি দেখতে বেশ সুন্দর হয়।

বসা জোর ঝুড়ি ঃ প্রথম বুনানীর পর তেউড়ী অর্থাৎ তিনটি গোলবেতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনানী দিয়ে আবার উলটিয়ে থিউটিগুলোকে খাড়া রেখে ওপর-নীচ ক'রে বুনে যাও। তারপর ঘুটিং নামক লতা দিয়ে মুখের গোল চাকার জায়গায় বেঁধে দাও।

এই নিয়মে লতা বা বেত দিয়েও নানা রকমের ঝুড়ি বুনা যেতে পারে।

———

টিনের খেলনা

চরকী

একটা বটের পাতা কি একখানা পোষ্টকার্ডের ক খ চিহ্নিত অংশ কেটে ফেলে ঙ কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে একটা সরু কাঠি ঢুকিয়ে দাও। তারপর বাতাস যে-দিক্ থেকে জোরে বইছে, সেই দিকে কাঠিটা ধ'রে দাঁড়াও—দেখবে বন্-বন্ ক'রে ঐ পাতাটা বা পোষ্টকার্ডখানা ঘুরতে আরম্ভ করবে।

এই খেলনাটায় পরিশ্রমও নেই, খরচ ত নেই-ই। কিন্তু এর একটা অসুবিধা হচ্ছে, বাতাস চাই। বাইরে জোর বাতাস না থাকলে তোমার পাতা বা কাগজ ঘুরবে না। সেইজন্য ঘরের মধ্যে এই 'চরকী' খেলনাটা অচল।

সর্ব্বত্র এই খেলনা সচল করা কঠিন কিছু নয়। এইজন্য একটা লোহার তার (১) ও কিছু পাতলা টিন (২, ৩, ৪) লাগবে।

দু'খানা পাতলা, ছোট টিনের চাকার ভেতর দিয়ে একটা লোহার সরু তার ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ঐ দু'খানা চাকার সঙ্গে আর তিন-চারখানা চাকতি (৩) সংযুক্ত থাকবে। টিন দিয়ে আর একটা সরু চোঙ্গ (৪) করতে হবে। এই চোঙ্গটা থাকবে লোহার তারের শেষাংশের সঙ্গে জড়িত। চোঙ্গটির 'ক' মুখে ফুঁ দিলে সেই বাতাসটা 'খ' মুখ দিয়ে জোরে বেরিয়ে গিয়ে চাকতিতে (৩) ধাক্কা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে টিনের চাকা দুটিও (২) ঘুরতে থাকবে। টিনের চাকা ও চাকতিগুলোতে রং-চং ক'রে নিলে খেলনাটি দেখতে সুন্দর হবে।
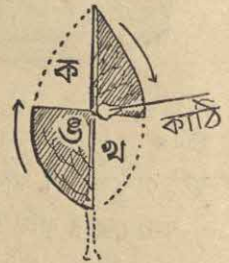
বটগাছের পাতায় 'চরকী বাজী' খেলনার কথা বলতে গিয়ে এই ধরনের আর একটা খেলনার কথা মনে পড়ল। এটা লাট্টু ঘুরানোর খেলনা। কাঠের লাট্টু ও লেপচি তৈরী করা কঠিন না হলেও সেজন্য যন্ত্রপাতি বা মিস্ত্রির সাহায্য চাই। কিন্তু পিটুলী গাছের গোল গোল ফলগুলো দিয়েও সুন্দর লাট্টু হতে পারে। একটা পিটুলী ফলের মাঝখান দিয়ে বরাবর একটা ঝাঁটার কাঠি (ক খ) পুরে দাও। ফলের বোঁটার দিক্‌টায় আট-নয় আঙ্গুল কাঠি বেরিয়ে থাকবে (ক), আর নীচের দিকে থাকবে মাত্র দুই-এক আঙ্গুল (খ) বেরিয়ে। তারপর ঐ বোঁটার দিক্‌টার কাঠি দুই হাতের মধ্যে নিয়ে পাক দিয়ে সমতল মেঝে বা উঠানে ছেড়ে দাও ; দেখবে ঐ পিটুলীর ফলটি সুন্দর ঘুরবে। পিটুলীর ফলটার মাঝখানের পরিধিতে চূণ লাগিয়ে নিলে ফলটি ঘুরবার সময় আরও সুন্দর দেখাবে।
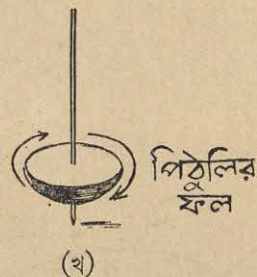
খেলনা ষ্টীম্‌লঞ্চ বা বাষ্পীয় পোত

টিন দিয়ে একটি মোটর লঞ্চ তৈরী কর। এর মধ্যে থাকবে দুটো টিনের পাইপ (খ, গ), একটা ল্যাম্প (ঙ), একটা ঢাকনি (চ)। (পরপৃষ্ঠার প্রথম ছবিখানি দেখ।)
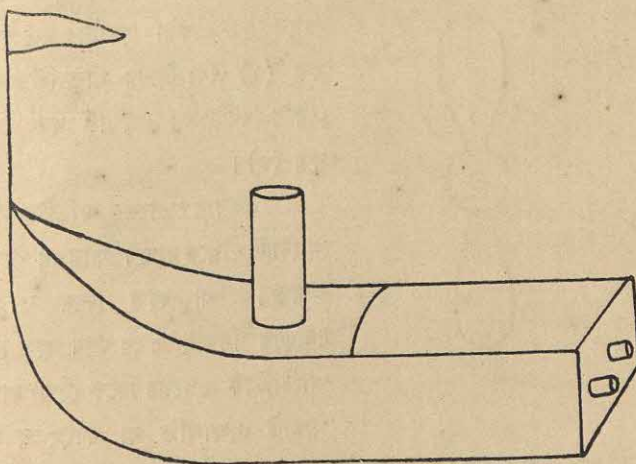
খেলনা ষ্টীম্‌লঞ্চ

'ছ' হচ্ছে ল্যাম্প বা প্রদীপকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার হাতল। লঞ্চের জ, ঝ স্থানে কিছু

সীসা কি মাটি দিয়ে ভারী ক'রে নিতে হবে যেন তার ফলে খ, গ পাইপের মুখ দুটি জলের মধ্যে থাকে।
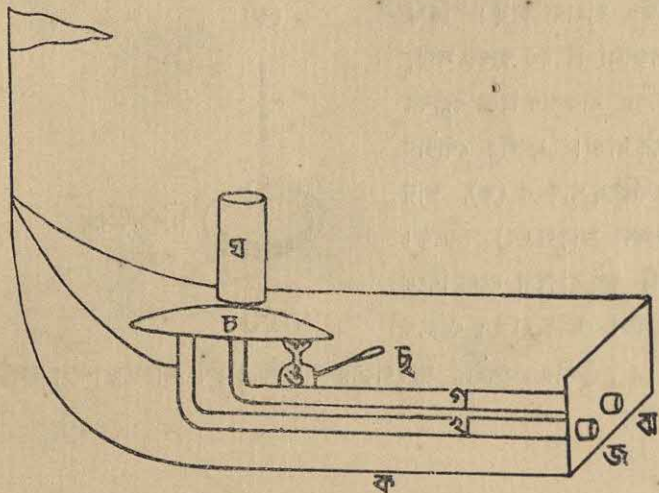
খেলনা ষ্টীমলঞ্চের খুঁটিনাটি

ল্যাম্পে গ্যাস তৈরী হওয়ার ফলে ঐ গ্যাস পাইপের ভেতর দিয়ে জলে ধাক্কা দেবে এবং পট্‌পট্‌ শব্দ হবে। এই ভাবে লঞ্চটি সম্মুখদিকে এগিয়ে চলবে।

ফড়িং বাজী

একটা তারকে সমান দু'ভাঁজ ক'রে দড়ি পাকানোর মত ক'রে জড়িয়ে নাও। টিন ভাঁজ ক'রে ছোট একটা আংটার মত তৈরী কর (২) এবং টিনের পাত দিয়ে আর একটা ফড়িংএর পাখার মত তৈরী কর (৩)।
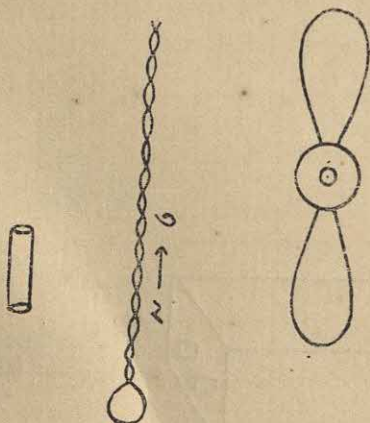
এইবার তারের দড়িটির মধ্যে আংটাটি পরিয়ে দাও। তারপর পাখাটি পরাও। বাঁ হাত দিয়ে তারটির গোড়ার দিক্‌টা ধ'রে ডান হাত দিয়ে আংটাটিকে ওপরের দিকে ঠেলা দাও। পাখাটি প্রজাপতি বা ফড়িংএর মত উড়ে যাবে আকাশে। ওটাকে কুড়িয়ে এনে আবার পরিয়ে এইভাবে উড়ান যেতে পারে।

তারের বাজনা

বেহালা বা গিটার

সহরের রাস্তায় অনেক সময় অ-বাঙ্গালীকে এই খেলনা-বেহালা বিক্রী করতে দেখা যায়। তারা এই তারের বাদ্যযন্ত্রটিতে সুন্দর একটা করুণ সুর তুলে সহজেই লোকের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে।

দেশীয় লোকে এই খেলনা তৈরী ক'রে বেশ দু'পয়সা আয় করতে পারে। খেলনাটি তৈরী করাও খুব কঠিন নয়।

একটা মাটির পাত্রের (ক, খ) মধ্যে একটা বাঁশের সরু নল (গ) এপার ওপার (ঘ, ঙ) ঢুকিয়ে নাও। তারপর ঐ মাটির পাত্রটির ওপরের অংশ খুব পাতলা চামড়া দিয়ে ছেয়ে নিতে হবে। ব্যাঙের পাতলা চামড়া বা পশুর নাড়িভুঁড়ি যে পাতলা থলির মধ্যে থাকে ঐ চামড়া হলেও চলতে পারে। অভাবে অনুরূপ কোন শক্ত কাগজ দিয়েও কাজ চালানো যায়।

তারপর ঐ নলের পিছন দিকে (ঙ) ছিদ্র করে, পিতল বা তামার দুটি সরু তার বাঁধ।
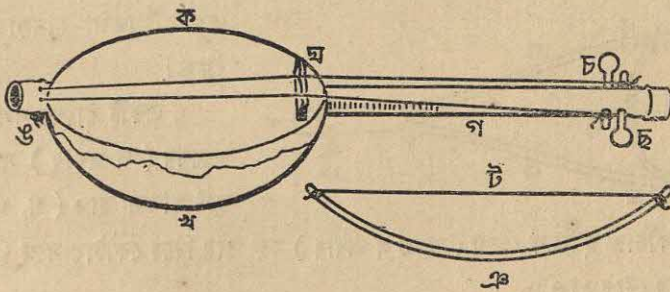
ঐ তার চামড়ার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে নলের মাথার ছিদ্রপথে অবস্থিত চ, ছ কাঠির সঙ্গে জড়িয়ে নাও। ঐ চ বা ছ কাঠি ডানদিকে ঘুরালে ওর সঙ্গে বাঁধা তারটি খুব টান-টান হবে,

আবার বাঁ-দিকে ঘুরালে তারটি ঢিলে হয়ে আসবে। নলটির ঘ স্থানে ভাঙ্গা চিরুণী, কাঠ, শক্ত পিচবোর্ড কিংবা যা হয় একটা কিছু দিয়ে ঐ তার দুটিকে উঁচু করে দাও—যাতে চামড়ার ঢাকনীটি থেকে ঐ তার দুটি উঁচু হয়ে থাকে।

এইবার একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে ছোট একটা ধনুকের মত তৈরী কর (ঞ) ; ঐ ধনুকের ছিলা (ট) তৈরী হবে ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে। রজন দিয়ে ঐ চুল মেজে নাও।

এইবার খেলনাটির গ স্থানে বাঁ-হাত দিয়ে ধ'রে ছড় (ঞ) দিয়ে তার দুটির ওপর ছিলা (ট) টান—ঠিক যে ভাবে বেহালা বাজায় আর কি!

বাঁ-হাতের আঙ্গুল দিয়ে কি ভাবে ঐ তার টিপলে কেমন সুর হবে, সেটা যে বাজাতে জানে তার কাছ থেকে শিখে নিতে হবে—অথবা নিজের চেষ্টায়ও অনেকটা ধরা যেতে পারে।

একতারা

কেবল একটিমাত্র তার দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী হয় ব'লে এর নাম হয়েছে 'একতারা'।

বাউল সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবেরা এই একতারা বাজিয়ে গান করে। সাধারণতঃ পাকা লাউয়ের খোলে একতারা তৈরী হয়। পাকা লাউয়ের মুখ কেটে ভেতরের অংশটা ফেলে দিয়ে ওর মধ্যে গোবর পুরে রাখা হয় কিছুদিন। তারপর ওটাকে পরিষ্কার ক'রে হাত-করাত দিয়ে ওর নীচের অংশটা কেটে ফেলা হয়। পরে ঐ নীচের দিক্‌টায় একটা পাতলা চামড়া লাগিয়ে এবং ঐ পাত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে এমন সরু বাঁশ দিয়ে একতারা তৈরী করা হয়।

কিন্তু খেলনা-একতারা তৈরী করতে হলে একটা ছোট টিনের কৌটা হলেই যথেষ্ট। যে কোনও একটা টিনের কৌটার (ক) নীচের দিক্‌টা কেটে ফেলে ওখানে লাগাতে হবে একটা পাতলা চামড়া (চ) বা অনুরূপ কিছু।

খ একটি বাঁশের নল। এর খানিক অংশের (প অবধি) মাঝখানটা চিরে দুটি পাতলা হাত (গ, খ) তৈরী কর। ঐ হাত দুটি কৌটার দু'দিকে চেপে (ফ ও ম অবধি) সরু তার দিয়ে কৌটার সঙ্গে (গ, ঘ ও ফ, ম স্থানে) বেশ ক'রে বেঁধে দাও।

তারপর ঐ চামড়ার ছাউনীর (চ) ঠিক মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র কর। একটা পিতল বা তামার সরু তারের একপ্রান্তে একটা কড়ি বাঁধ (ট), ঐ তারটির অপর প্রান্ত ঐ চামড়ার ছিদ্রপথ

দিয়ে ঢুকিয়ে নলের মাথায় ঞ কাঠিতে নিয়ে টেনে বাঁধ। ঞ কাঠিটি ডানদিকে ঘুরালে তারটি খুব টান-টান হবে, কিন্তু বাঁ-দিকে ঘুরালে ওটা ঢিলা হয়ে যাবে।

এই যন্ত্রটির জ ঝ অংশে যথাক্রমে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও অপর আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধ'রে ডান হাতের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে তারের ঙ স্থানে নাড়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতের আঙ্গুলে চাপ দিলে ও ঢিল দিলে যন্ত্রে বিভিন্ন আওয়াজ হবে।

মাত্র এক হাতেও এই যন্ত্র বাজানো যায়। বাউল সন্ন্যাসীরা যন্ত্রটির ঐ জ ঝ স্থানে ডান বা বাঁ-হাতের যথাক্রমে বুড়ো আঙ্গুল ও অপর আঙ্গুল দিয়ে ধ'রে তর্জ্জনী দ্বারা তারের ঙ স্থানে কোলের দিকে ও সম্মুখ দিকে নাড়া দিয়ে নেচে নেচে গান করে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনতে পেলাম পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহল। 'রং-দোল'—তাই তারা আরম্ভ করেছে রং-খেলা। শ্রীমান্ পার্থ একটা ফুটবলের পাম্পারকে পিচকারী ক'রে বীর-বিক্রমে ছুটেছে—গনা, মদন, নিমে ওদের গায়ে রং দেবে ব'লে।

আধ ঘণ্টাও হয় নি—রেখা এসে কেঁদে জানাল—মায়া কেন তার গায়ে দোয়াতের কালী দিল? ছোট মেয়ে জাপু ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, সুধাময় তার গায়ে রং না দিয়ে কাদা-জল দিলে কেন?

ওদের মধ্যে নেমে যেতেও সাহস হয় না। ওপর থেকে ডেকে বললাম—"হারে তোরা বসন্তোৎসব কি ভূত-উৎসব আরম্ভ করলি? রং নিয়ে খেলা করবি কর। দোয়াতের কালী, গোবর, কাদা-জল এসব কি?—ছিঃ!"

ওরা বলে—"রং পাব কোথায়? চার আনার রং যা দিয়েছে তাতে পূরো একটা বোতলও হয় না।"

ও বাড়ীর নিমের মা কাপড় মেলছিলেন; বললেন—"আর দু'দিন পরে লিখবার কালীও পাবি-নে। রং কি দেশে আছে যে রং-খেলা করবি? বিদেশ থেকে রং আসত, যুদ্ধের জন্য তা গেছে

বন্ধ হয়ে। সধবাদের আর দু'দিন বাদে সাদা থান কাপড় পরতে হবে যে! কলওয়ালারা পাড়ের রঙিন সুতো পাবে কোথায়?"

ওপরের ঘরে আজ আমার স্বেচ্ছা কারাবাস। বাইরে গেলেই জামা-কাপড়ে রং লাগবার গুরুতর সম্ভাবনা। ভাবছি বসন্ত দেখা দিল তার বর্ণে, গন্ধে ও কোকিলের সুমধুর কণ্ঠস্বরে। প্রকৃতির এই রংয়ের খেলায় ভারতবাসী এতকাল যোগ দিয়ে এসেছে—আজ কোন্ দুষ্কৃতির ফলে তাদের এই দীনতা—রংয়ের বদলে কিসের জন্য আজ তারা কাদা আর লিখবার কালী নিয়ে এত রঙ্গ করছে?

উত্তর আছে অবশ্য এর—যুদ্ধ। যুদ্ধের জন্যই আজ বিদেশী রং আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভারতবাসী এতকাল যে বসন্তোৎসব করেছে—সে কি বিদেশ থেকে রং আমদানী ক'রে?

ভারতের প্রাচীন রাজারা যে বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরতেন, তাঁদের আনন্দোৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে যে বিবিধ রঞ্জন-দ্রব্যের উল্লেখ দেখতে পাই—সেগুলো কি তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করতেন?

এর উত্তর পেতে হলে রঞ্জন-শিল্পের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাস জানা দরকার।

বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশে রং উৎপাদন করা হ'ত গাছ, ফল, পাতা ও মূল প্রভৃতি হতে। কিন্তু এই সকল রং চিরস্থায়ী নয়। এইজন্য আবিষ্কৃত হ'ল ফটকিরী। ফটকিরী রংকে বেশী দিন স্থায়ী করে। এই ফটকিরী আবিষ্কারের জন্য রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাসে ভারতের নাম অমর হয়ে থাকবে।

তারপর বিজ্ঞানের যুগে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে) যখন কৃত্রিম উপায়ে রং তৈরী আরম্ভ হ'ল তখন থেকে এই দেশীয় রঞ্জন-শিল্পের আদর গেল কমে। ইংল্যাণ্ডের পার্কিন, ইয়ংম্যান, লিকনসন্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আলকাতরা প্রভৃতি থেকে যে সব কৃত্রিম রং আবিষ্কার করলেন, তা দেশীয় রং থেকে বাস্তবিকই অনেক ভাল হ'ল। রংয়ের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার বর্ণ-চাকচিক্য, দ্রবত্ব, সমানভাবে রঞ্জন-ক্ষমতা এবং স্থায়িত্বের ওপর। যা হোক, ইংল্যাণ্ড এসব আবিষ্কার করল বটে, কিন্তু কৃতিত্ব লাভ করল এতে জার্ম্মাণী। দেখতে না দেখতে সেখানে গ'ড়ে উঠল বিরাট আই-জি-কার্ব্বেন ইণ্ডাষ্ট্রী।

কিন্তু এখন উপায় কি? বিদ্যুতের আলো যদি না পাওয়া যায় তা'হলে অন্ধকারে হাতড়ে না মরে আমাদের রেড়ীর তেলের প্রদীপই জ্বালাতে হবে। দেশীয় লোকের আত্ম-বিস্মৃত হওয়া কোন কাজের কথা নয়। আগেকার দিনে কোন্ কোন্ জিনিসে কি কি রং হ'ত তা একটু জানা দরকার। এ সম্বন্ধে একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।

উদ্ভিজ্জ রং

গাছের নাম	ব্যবহৃত অংশ	রং
পলাশ	ফুল	রক্ত ও পীত।
কাঁটাল	কাঠ	পীত।
শিউলী	ফুল	পীত।
কুসুম	„	রক্ত ও পীত।
কুমকুম	„	পীত।
মান্দার	„	রক্ত।
গাঁদা	„	পীত।
বকম	কাঠ	লাল, কালো, নীল।
হলুদ	মূল	পীত।
পেঁয়াজ	খোসা	পীত।
মেহদী	পাতা	লাল।
কমলা	খোঁসার গুঁড়া	লাল, পীত।
নীল	গাছের নির্য্যাস	নীল।
মঞ্জিষ্ঠা	মূল ও কাণ্ড	লাল।
হরিতকী	ফল	বাদামী, কালো।
খয়ের	কাঠের সারাংশ	বাদামী।
চেরু, চে	মূল	লাল।

পলাশ—শুকনো অথবা টাটকা কাথ থেকে লাল ও পীতবর্ণ পাওয়া যায়। পীতবর্ণের জন্য কাপড় আগে ফটকিরীর জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ঐ রংয়ের জলে সিক্ত করতে হয়। সামান্য পরিমাণ ক্ষার দ্রব্য—যেমন সোডা মিশিয়ে নিলেই পীত রংটি লাল হয়ে যায়। রংয়ের এই খেলা খুব মজার ও আশ্চর্য্যের সন্দেহ নেই।

বকম কাঠ—এই কাঠের জলে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে নিলে লাল, লৌহ-লবণ মিশিয়ে নিলে কালো ও তুঁতে মিশিয়ে নিলে নীল রং পাওয়া যায়।

কুসুম ফুল—ফুলগুলোকে বেশ ক'রে পিষে নিয়ে সামান্য অম্ল-মিশ্রিত জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর সাজিমাটি-মিশান জলে ঐ ফুলগুলো ভিজিয়ে রাখতে হয়। বর্ণ টা চক্‌চকে করতে হলে একটু লেবুর রস দেওয়া যেতে পারে।

শিউলি—ফুলের বোঁটাগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ ক'রে নিতে হয়। কাপড়ে রং করার সময়ে ঐ জলে লেবুর রস ও ফটকিরী দিয়ে নিলে রংটা স্থায়ী হবে।

এই সকল উদ্ভিজ্জ রং ছাড়াও পূর্ব্বে এ দেশে জান্তব পদার্থ দ্বারাও রং করা হ'ত। তাদের কয়েকটি নাম দেওয়া হ'ল।

জান্তব রং

গোরোচনা—ভারতীয় লোহিত। গরুকে আমের পাতা খাওয়ালে সেই গরুর মূত্র থেকে এই রং পাওয়া যায়। গোমূত্রকে শুকিয়ে নিতে হয়।

ইন্দ্রগোপ—প্রায় আটশো বছর আগেকার 'রসার্ণব' নামক গ্রন্থে এই ইন্দ্রগোপের উল্লেখ আছে। একরকম পোকার শুকনো শরীর ফুটন্ত জলে গুলে নিলে এই ইন্দ্রগোপ বা কোচিনীল পাওয়া যায়।

লাক্ষা—প্রাচীনতম ভারতীয় রং। বৈদিক যুগেও এই রং ব্যবহৃত হ'ত রেশমী ও পশমী বস্ত্র রং করতে। আলতা তৈরী করতেও এই রং ব্যবহৃত হয়।

কি ক'রে কাপড়ে রং করা যায়?

হলদে রং—গরম জলে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে তার মধ্যে কাপড় চুবিয়ে নাড়তে হবে প্রায় আধঘণ্টা। তারপর নিংড়িয়ে নিয়ে ফটকিরীর জলে শুকিয়ে নিলেই হলুদ রংয়ের কাপড় হবে। আবার নীল রংয়ের কোন কাপড় এই ভাবে হলুদ রং করতে গেলে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে সবুজ রং।

কালো রং—হরিতকীর গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে নিংড়িয়ে নিয়ে চুণের জলে (পাঁচ সের জল আর সিকি ছটাক পাথর চুণ) ফেলতে হবে। তারপর ওটা আবার নিংড়ে নিয়ে হিরাকষ-মিশ্রিত জলে প্রায় আধঘন্টাকাল নাড়তে হবে। তারপর নিংড়ে শুকিয়ে নিলেই হ'ল।

গোলাপী লাল—পাঁচ সের গরম জলে আড়াই ছটাক হরিতকী-চূর্ণ দিয়ে গরম করতে হবে। সেই জলে এক রাত্রি কাপড়খানিকে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ওটা নিংড়ে নিয়ে চুণের জলে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। পরে ওটা আবার নিংড়ে ফটকিরীর জলে দিতে হবে। তারপর ঐ কাপড় চে-মূল ও মঞ্জিষ্ঠার ফুটানো জলে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই ওটা সুন্দর গোলাপী লাল হবে।

এর আগে ফুলকী বাজী, বেলুন বাজী প্রভৃতির কথা বলেছি। এবার আরও কয়েকটি বাজীর কথা বলব—যা তোমরা সহজেই তৈরী করতে পার।

চাবি পটকা

একটা বাঁশের বাখারীর (ক) সঙ্গে একটা চাবি শক্ত ক'রে বেঁধে নাও। তারপর একটুখানি তারের সঙ্গে একটা পেরেক আটকে নাও (গ)।
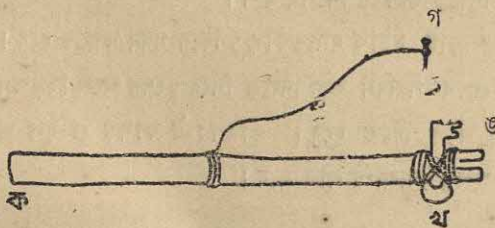
এইবার চাবিটির মাথার গর্ত্তের মধ্যে (ঙ) কয়েকটি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদ পুরে নিয়ে ঐ পেরেকটির সরু মুখ চাবির গর্ত্তে ঢুকিয়ে দিয়ে, দেওয়ালের গায়ে কি কোনও শক্ত জিনিসের ওপর বাখারীটির 'ক' স্থানে ধ'রে পেরেকটির মাথায় ঘা দাও ; দেখবে, বন্দুকের শব্দের মত বেশ জোরে শব্দ হবে।

কৌটা বাজী

ঢাকনীওয়ালা একটা টিনের ছোট কৌটা (ক) নাও। কৌটাটির তলায় খুব ছোট একটি ছিদ্র (খ) কর। এইবার ঢাকনীটি (গ) খুলে তার মধ্যে যৎসামান্য কারবাইড দিয়ে এবং

উহাতে খুব অল্প একটু জল দিয়েই কৌটাটি এঁটে নিয়ে উল্টিয়ে ধর। তারপর ঐ খ ছিদ্রটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধ'রে রাখ। অল্প একটু পরেই ওখানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে দিলে, দুপ ক'রে একটি শব্দ হয়ে কৌটাটি ওপর দিকে উঠে যাবে—আর ঢাকনীটি প'ড়ে থাকবে মাটিতে।

আগুন ধরাবার সময় মুখটা একপাশে সরিয়ে রাখবে এবং হাতটাও সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেবে, নতুবা ঐ কৌটাটি জোরে ওপরে উঠবার সময় আঘাত দিতে পারে।
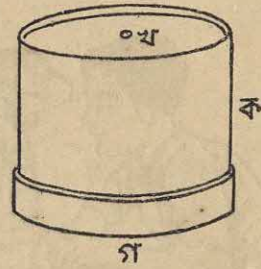
ছুঁচো বাজী

ধর দশটা ছুঁচো বাজী তোমরা তৈরী করবে। এজন্য দরকার—কাঠকয়লার গুঁড়ো, গন্ধক, পটাস। গন্ধক, পটাস, সোরা, মোমছাল প্রভৃতি জিনিস নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করা নিরাপদ নয় ব'লে ওগুলো বিনা লাইসেন্সে বিক্রী হয় না।

দশটা ছুঁচো বাজীর জন্য—তিন চামচে কাঠকয়লার গুঁড়ো, আধ চামচে গন্ধক ও দু' চামচে পটাস—আলাদা আলাদা গুঁড়ো ক'রে পরে একসঙ্গে মিশিয়ে নাও।

এইবার দোকানে যে ভাবে বিড়ি বাঁধে—ঐ ভাবে কাগজের ছোট ছোট ঠোঙ্গা তৈরী ক'রে আঠা দিয়ে এঁটে নাও এবং ঐ মিশানো গুঁড়োগুলো সমান দশ ভাগ ক'রে, দশটা ঠোঙ্গার মধ্যে পুরে মুখ এঁটে দাও আঠা দিয়ে। তারপর ঐ ঠোঙ্গার মুখে আগুন দিলে ওটা ফুর্-ফুর ক'রে ঘুরে বেড়াবে।

কাগজ নিয়ে খেলা

ধাবমান কুমীর

প্রয়োজনীয় জিনিস : লোহার তার, পাতলা পিচবোর্ড, অল্প মোটা কালো বা দাগ-দেওয়া কাগজ, রবারের সরু ফিতে, পাতলা লাল ও কালো কাগজ, একটা মাটির ঢেলা, কালো স্থতো।

স্থবিধার জন্য খেলনা কুমীরটাকে আমরা তিন ভাগ ক'রে দেখতে পারি—তার মাথা (ক), দেহাংশ (খ) এবং যে স্থতো ধ'রে টানলে ও ছেড়ে দিলে কুমীরটি ছুটতে থাকবে অর্থাৎ মাথার ১ চিহ্নিত স্থানের নীচে যে ইঞ্জিনীয়ারী বিদ্যা আছে সেইটা (গ)।

প্রথমে মাথার কথাই ধরা যাক্। একটা সবুজ, বেগুনী বা নীল রংএর পাতলা পিচবোর্ড ছবির অনুরূপ কেটে, তার ওপর যথাস্থানে দুটি চোখ বসাতে হবে। গোল ক'রে দুই টুকরো কালো কাগজ কেটে তার চারপাশে আবার পাতলা সাদা কাগজ এঁটে দিলে চোখ দুটো দেখতে ভাল হবে। মাথা ও দেহের সংযোগ-স্থলেও এক টুকরো পাতলা লাল কাগজ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেম্‌নিভাবে কেটে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।

তারপর কুমীরের দেহ। অল্প মোটা কালো বা দাগকাটা কাগজ দুই ভাঁজ ক'রে নাও। তারপর সেই দু'ভাঁজ করা কাগজটার মাঝখানে মোটা হয় (যেটা হবে কুমীরের পেট) এইভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। এখন আবার ছোট (এক ইঞ্চির চার কি ছ' ভাগ) ভাঁজ কর, উল্‌টিয়ে আবার অনুরূপ ভাঁজ কর। এই ভাবে ক্রমাগত একবার এদিকে আরবার উল্‌টিয়ে ওদিকে ভাঁজ ক'রে যাও। তারপর দুই হাত দিয়ে প্রথমকার সেই দুই ভাঁজ আস্তে আস্তে খোল।—দেখবে, কুমীরের দেহ তৈরী হয়ে গিয়েছে। এখন এক টুকরো লাল কি হলুদ রংয়ের পাতলা কাগজ কেটে একটা লেজ তৈরী ক'রে নাও।

এইবার কল-কব্জার কথা। ১ চিহ্ন অনুযায়ী মাঝখানে সরু এমন একটা শক্ত মাটির ঢেলায় দুইটি ছিদ্র করতে হবে। একটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে একটা সরু রবারের ফিতে টেনে এনে লোহার তারের বাঁকান জায়গায় জড়িয়ে আবার ওটাকে দ্বিতীয় ছিদ্রের ভেতর দিয়ে লোহার তারের অপর বাঁকান দিকে বাঁধতে হবে। তারপর ঐ ঢেলার অপেক্ষাকৃত সরু মাঝখানটায় একটা সরু স্থতো শক্ত ক'রে বাঁধ—যেন ঐ স্থতোর এক জায়গায় একটা গিঁট থাকে। এখন ঐ গিঁটের কাছে আর একটা কালো লম্বা স্থতো বাঁধ। এইবার ঐ প্রথম স্থতোটাকে টেনে টেনে ঘুরিয়ে নাও—তাতে ঐ কালো লম্বা দ্বিতীয় স্থতোটাও ঐ মাটির ঢেলার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। তারের বাঁকান-মুখ দুটো কিন্তু পিচবোর্ডের ভেতর দিয়ে ১ চিহ্নিত স্থানের দুইপাশ দিয়ে আসবে। কালো স্থতোটা এইবার ১ চিহ্নিত স্থানে পিচবোর্ডের ভেতর দিয়ে ওপর দিকে তুলে নাও।
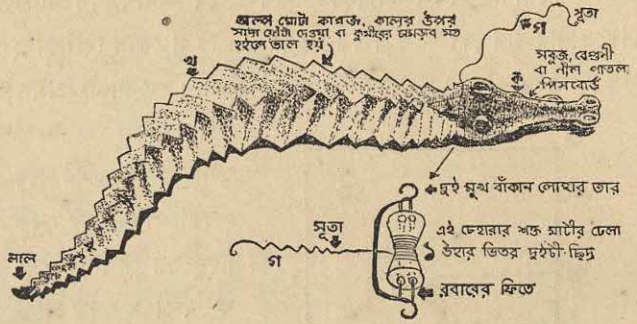
এখন এই স্থতোটা ধ'রে টেনে ছেড়ে দিলেই নীচের মাটির ঢেলার সঙ্গে ঐ স্থতোর পাক পড়ায় ঢেলাটি গড়াতে থাকবে আর কুমীরও ছুটবে সেই সঙ্গে।

ঠিক এই নিয়মে কেবল কুমীর নয়, পাখী এবং দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরী রেল-গাড়ীও চালান যেতে পারে।

চলন্ত মাছ

তোমাদের ধাবমান কুমীরের কথা বলেছি, এবার চলন্ত মাছের কথা বলছি। মাছই হোক্ আর নৌকাই হোক্, জলের মধ্যে চলার প্রধান কথা হচ্ছে,—পিছনের দিকে জলে ধাক্কা দিতে হবে।
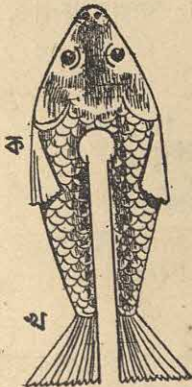
একখানা পোষ্ট কার্ডের মত কাগজকে মাছের মত ক'রে কাট। মাছটির মাছখানটায় গোল ক'রে একটি ছিদ্র কর। তারপর ঐ ছিদ্র থেকে বরাবর মাছের লেজ পর্য্যন্ত ফাঁক ক'রে কেটে নাও। বালতি, চৌবাচ্চা কি পুকুরের পরিষ্কার জলে ঐ কাগজের মাছটাকে ছেড়ে দিয়ে ওর ঐ ছিদ্রের মধ্যে কয়েক ফোঁটা তেল দাও। ঐ তেলটা লেজের দিকের ঐ ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তার ফলে পিছনের জলে পড়বে ধাক্কা, তাতে মাছটা সম্মুখ দিয়ে চলতে আরম্ভ করবে।

ক

খ

বালতিতে এই মাছ দু'চার বার চালাতে হলে জল পালটিয়ে দেওয়া দরকার।

দোয়াত

একখানা কাগজ চারদিক সমান ক'রে অর্থাৎ বর্গ আকারে কেটে নাও। ধর, ঐ কাগজের চারকোণার নাম যেন ক খ গ ঘ। এখন খ আর গ কোণ মিলিয়ে দু ভাঁজ কর। ওটাকে আবার ভাঁজ কর। এইবার ক ও ঘ কোণ এক জায়গায় এল। এখন ঐ কাগজটাকে খুলে ফেলে এবং ক খ ও গ ঘ কোণ একত্র ক'রে ওদের মাঝখানে ভাঁজ পড়ে এমনভাবে ভাঁজ ক'রে একটা ত্রিভুজের মত কর। এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু যেন ঙ। এইবার ক খ গ ঘ প্রান্ত চারটি দু'দিক থেকে ঙ বিন্দুর সঙ্গে লাইন সমান রেখে যোগ কর। এখন একটা চতুর্ভুজ হ'ল। এই চতুর্ভুজের নতুন নাম দেওয়া যাক্ চ ছ জ ঝ। এই চারটি কোণকে আবার ভাঁজ ক'রে মাঝখানের দাগের সঙ্গে সমান ক'রে লাগাও। এইবার গোড়ার সেই ক, খ, গ, ঘ প্রান্তগুলোকে ভাঁজ ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। এখন রম্বসের মত যে জিনিসটি তৈরী হ'ল—দেখবে তার একদিকে ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকে ফুঁ দাও, অমনি দোয়াত তৈরী হয়ে যাবে।
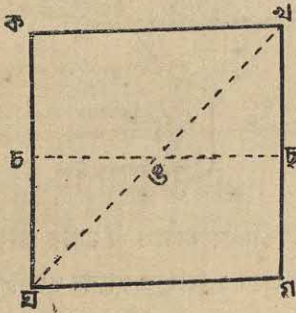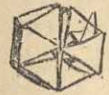
জাহাজ

স্কোয়ার কাগজ ক খ গ ঘ'র মুখগুলো মধ্যস্থল চ বিন্দুতে মিলল। কাগজখানি উল্টিয়ে ফেল। ওটাকে আবার আগের মত ভাঁজ ক'রে প্রান্তগুলো চ বিন্দুস্থানে মিলাও। আবার উল্টাও, আবার
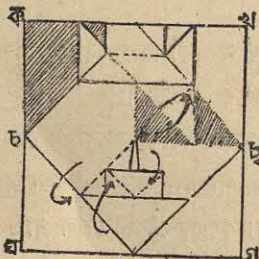
আগের মত ভাঁজ ক'রে চ বিন্দুস্থানে মিলাও। আবার উল্টাও এবং সম্মুখীন যে কোন দুটি প্রান্ত এক কর। ঐ দুটি এবার জাহাজের চোঙ্গের মত দেখাবে। এখন অপর প্রান্ত দুটি ধ'রে টান

দাও। এইবার চোঙ্গ দুটি একসঙ্গে ক'রে ভাঁজ ক'রে নিলেই দুই-চোঙ্গা জাহাজ হ'ল। তারপর এই জাহাজের চোঙ্গ দুটি ঠিক রেখে অপর প্রান্ত দুটির নীচের দিকে মুখ নামিয়ে দিলে 'জামার' মত হবে।

বাদুড়

কখগঘ স্কোয়ার কাগজের ক খ কোণ এক কর। ভাঁজ ক'রে একটা ত্রিভুজের মত কর। তারপর একদিকে এক ইঞ্চি মত রেখে মাঝখান থেকে ছিঁড়তে হবে। ঐ ছেঁড়া অংশ দুটি আবার ভাঁজ ক'রে ওর প্রান্ত সংযোগ ক'রে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধর (প)। এইবার লেজ অর্থাৎ একত্রিত ক খ'কে (ট) ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে সম্মুখে ও পিছনে টান। বাদুড় যেন উড়ছে ব'লে মনে হবে।
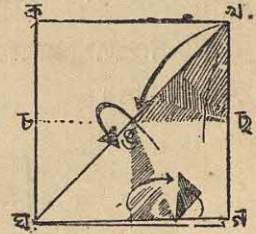
কখগঘ একটি বর্গ আকারের কাগজ নেও। ক খ'কে গ ঘ'র ওপর ফেলে কাগজটার মাঝখানে ভাজ কর। সেটাকে খুলে ফেলে ক'কে গ'এর ওপর ফেলে কোণাকোণি ভাঁজ কর, তারপর তাকে খুলে ফেলে খ, ঘ কোণাকোণি ভাঁজ কর; এই ভাঁজটাও খুলে ফেলে দাও।

এখন কাগজের ওপর শুধু ভাঁজের দাগ থাকল। কখ ও গঘ'র সমান্তরাল কাগজের মধ্যখানে যে ভাঁজ থাকল, ধর তার একপ্রান্ত চ অপর প্রান্ত ছ। এই চ ও ছ'কে একত্রিত কর, তা'হলে কখ রেখা গঘ'র ওপর প'ড়ে একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি করবে। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু ধর ঙ। এখন ক খ ঙ ত্রিভুজের ক কোণকে ঙ বিন্দুর ওপরে রাখ, খ কোণকেও ঙ বিন্দুর সাথে মিলিত কর। ক ও খ, ঙ বিন্দুতে এসে মিলল ব'লে যে চতুর্ভুজের সৃষ্টি হ'ল, ধর তার নাম ট ঠ ঙ চ। টঠ রেখাকে টঙ রেখার ওপর রেখে ভাঁজ কর। ঠ কোণ টঙ রেখা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে একটা পকেটের মত হবে। ক কোণকে সেই পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। ট ঙ চ ত্রিভুজকেও সেই একই ভাবে ভাঁজ কর। এখন একটা চিল তৈরী হয়ে গেল। গঘ রেখাটা কিন্তু এখনও
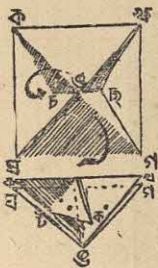
আমাদের রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা পকেটের মত ফাঁক আছে দেখ। তারপর আন্দাজমত লম্বা ক'রে একখানি কাগজ কেটে ঐ পকেটের ঠিক মধ্যখানে ঢুকিয়ে দাও। চিলের লেজ তৈরী হয়ে গেল। এখন তাকে আকাশে একটু তেরচা ভাবে ছুঁড়ে দিলে অনেক দূর চ'লে যাবে।

সিগারেটের খালি বাক্স দিয়ে ফুল তৈরী

কুড়ি-পঁচিশটা সিগারেটের খালি বাক্স যোগাড় কর। ওর ভেতরের কাগজটা ফেলে দিয়ে শুধু খোলটাই নাও।
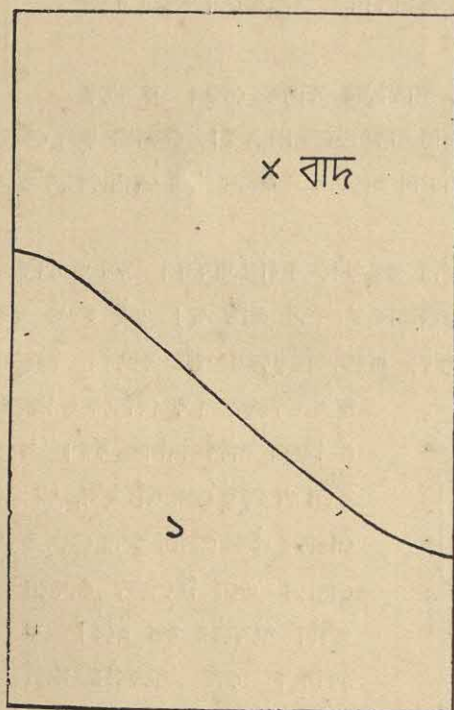
এইবার প্রত্যেকটি খোলকে চাপ দিয়ে ওর থেকে কাঁচি দিয়ে ১ অংশ (ছবি দেখ)

রেখে অন্য অংশ বাদ দাও। তারপর ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি খোলগুলো পরপর (ছবিতে যে ভাবে দেখান হয়েছে, ঐ ভাবে) বসিয়ে যাও। দেখবে, কেমন সুন্দর গোলাকার একটি ফুল তৈরী হয়েছে।
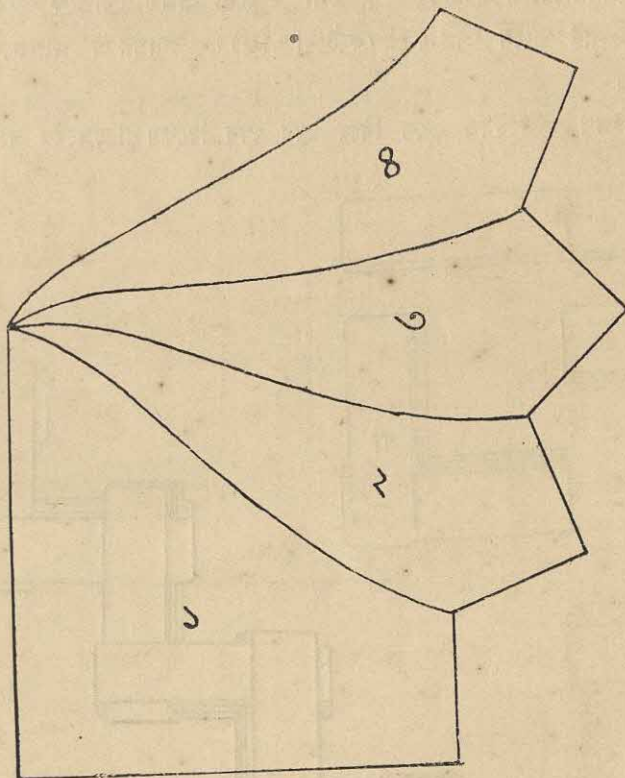
১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি খোলগুলোর সংযোগস্থলে আঠা দিয়ে এঁটে অথবা সুতো দিয়ে সেলাই ক'রে নিতে হবে।

সিগারেটের খালি বাক্স দিয়ে শেকল তৈরী

পূর্ব্বে যে সিগারেটের খোলের কথা বলা হয়েছে, ঐরূপ খোলকে চওড়ার দিক থেকে কাঁচি দিয়ে সাত-আট অংশে ভাগ ক'রে কেটে নাও (ক)। তারপর ঐ অংশগুলোর প্রত্যেকটিকে দু'ভাঁজ কর (খ)।

এইবার এইরূপ একটি ভাঁজ তুলে নিয়ে তার ডান দিকের বা সম্মুখের বাহুর ভাঁজের মধ্যে
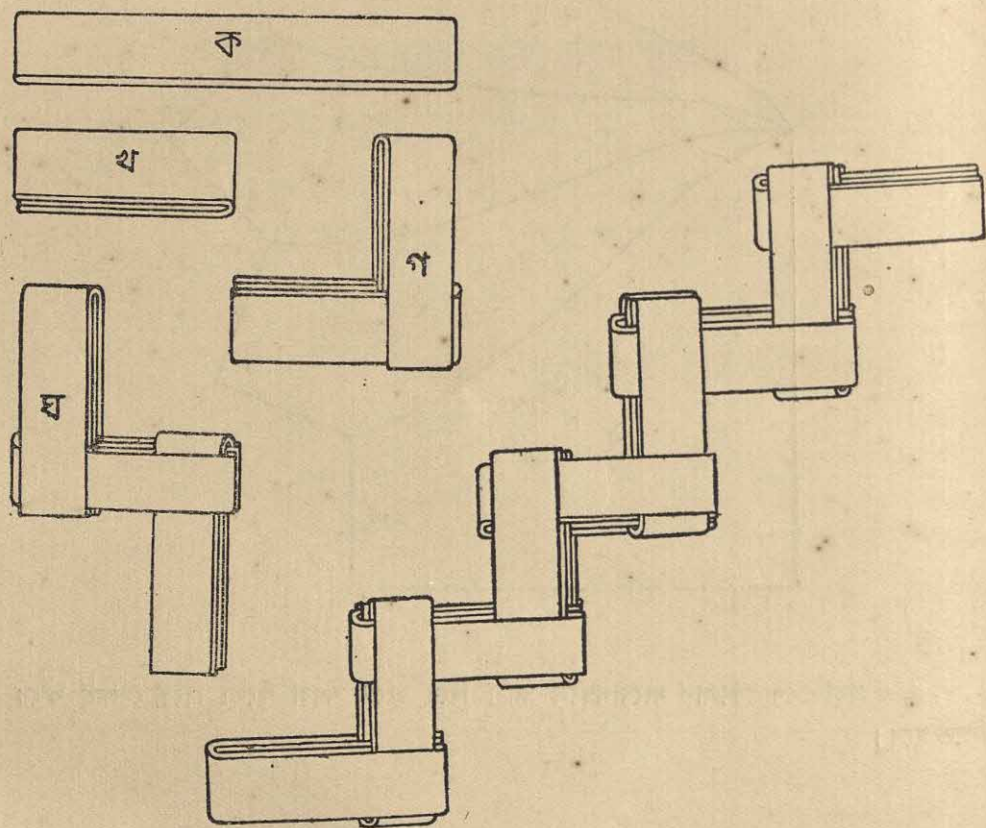
আর একটি দু'ভাঁজ-করা অংশের ডানদিকের বাহু ঢুকিয়ে দাও। এইবার ওটাকে ওল্টাও (ঘ), আবার পূর্ব্বের মত আর একটা দুভাজ-করা অংশ ঐ ভাবে পুরে দাও; আবার ওল্টাও। এই ভাবে অংশগুলো গেঁথে যাও। দেখবে সুন্দর শেকল তৈরী হয়ে গেছে।

কাগজের ফুল

একখানি পাতলা ও রঙিন কাগজকে (ক) চার ভাঁজ ক'রে নিয়ে শেষে কোণাকোণি ভাঁজ কর। তার পর কাঁচি দিয়ে (খ) ছবির অনুরূপ ক'রে কেটে নাও। ভাঁজ খুললে ওর থেকে চারটে পাপড়ি পাবে।

প্রত্যেকটি পাপড়িকে (গ) রুমালের ভাঁজে ফেলে ঐ পাপড়ি বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে
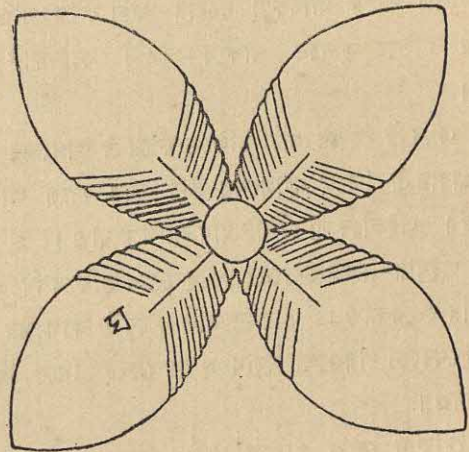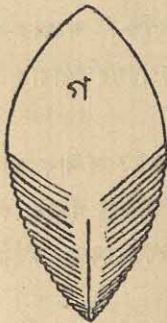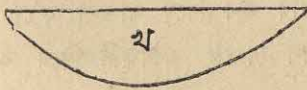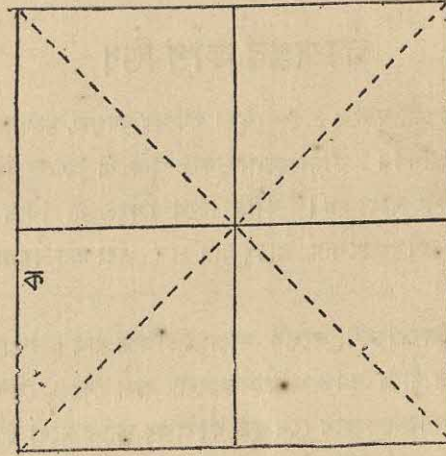
চেপে ধ'রে দু'ধার দিয়ে রুমালটি টেনে নাও। দেখবে পাপড়ির গোড়াটায় বেশ ছোট ছোট ঢেউ প'ড়ে গেছে।

এইবার ঐ চারটি পাপড়ির গোড়া আঠা দিয়ে এঁটে নাও (ঘ)। কাগজের ফুল তৈরী হবে।

এখন ইচ্ছা করলে ওর চেয়ে ছোট পাপড়ি কেটে নিয়ে ঐ ফুলের মধ্যে লাগিয়ে নিতে বা পাপড়িগুলোকে চওড়া বা লম্বা ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

কাগজের কাপ-ডিস্

কাগজের কাপ-ডিস্ তৈরী করতে চাই—ছেঁড়া খবরের কাগজ, ময়দার আঠা, ফটকিরী, শিরীষ কাগজ, কাঁচি আর গালার বার্নিশ। কাগজগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে নাও। টুকরাগুলো যেন এক ইঞ্চি থেকে ছু'ইঞ্চির মধ্যে হয়। কাঁচি দিয়ে কেটে না নিয়ে হাত দিয়ে কুচি করবে, কারণ কাঁচি দিয়ে কাটলে কাগজগুলোর পাশে ধার হবে এবং একটার সঙ্গে আর একটা ভাল ক'রে মিশবে না।

এইবার কাগজের ঐ টুকরোগুলো জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখ। তারপর একটা কাপ-ডিস্ বা বাটি নিয়ে তার ভেতর দিকের গায়ে ঐ ভিজে কাগজগুলো জল ঝেড়ে বেশী চাপ না দিয়ে সাজিয়ে ফেল। ওগুলো এমন ক'রে সাজাতে হবে যেন ছুটি কাগজের কুঁচির মধ্যে ফাঁক না থাকে অথবা একটির গায়ে আর একটির খুব বেশী চাপ না পড়ে।

অন্য পাত্রে খানিকটা ময়দার আঠা ক'রে নাও। ময়দায় জল দিয়ে পাতলা ক'রে নিয়ে উনানে চড়িয়ে ফুটাতে থাকবে। ওটা কাই-কাই মত হলে সামান্য ফটকিরী দিয়ে নামিয়ে নেবে।

এখন ঐ ময়দার আঠা তুলিতে ক'রে ঐ কাগজের গায়ে লাগিয়ে দাও। ময়দার আঠা লাগাবার পর আবার ঐ ভিজে কাগজের কুঁচি তার গায়ে আটকে দাও। তারপর আবার ময়দার আঠা লাগাও। এইভাবে সাত-আট বার লাগিয়ে যাও।

এইবার পাত্রটি উনানের কাছে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। সামান্য ভিজে থাকতেই কাপ থেকে ওটা বার ক'রে নাও। তারপর ভাল ক'রে ঐ কাগজের কাপটি রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে কাঁচি দিয়ে ওর এবড়ো-খেবড়ো ধারগুলো সমান ক'রে কেটে নিয়ে শিরীষ কাগজ দিয়ে বেশ ক'রে ঘসে সমান ক'রে নাও।

দোকান থেকে গালার বার্নিশ কিনে এনে এখন ঐ বাটি বা কাপটিতে মাখিয়ে দিলে বেশ সুন্দর কাপ তৈরী হবে। এইভাবে কাগজের টুকরো দিয়ে অনেক কিছুই তৈরী করা যেতে পারে।

পেপিয়ার মেশি

নরম মাটির তাল দিয়ে আমরা অনেক কিছুই গড়তে পারি; কিন্তু তার বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সেটা হয় ভঙ্গুর—একটু ঘা লাগলেই দু'খানা।

কিন্তু ঐ অনেক কিছু একটা 'চীনে মাটির' মত জিনিস দিয়েও তৈরী করা যায় আর সেটা তৈরী করা এমন কিছু কঠিনও নয়। এ জিনিসটির ইংরেজী নাম—পেপিয়ার মেশি।

কাগজের কাপ-ডিস্ যে ভাবে তৈরী করার কথা বলা হয়েছে পেপিয়ার মেশি দিয়েও অনুরূপ ভাবে কাপ-ডিস্, এমন কি খেলনা প্রভৃতিও তৈরী করা যায়।

এটা তৈরী করতে প্রয়োজন হবে—কিছু সাদা এন্টিক কিংবা ব্লটিং কাগজ, কিছু শিরীষ বা ময়দার আঠা এবং কিছু প্যারিস প্লাষ্টার।

সাদা কাগজ বা ব্লটিং যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন নয়। শিরীষের আঠা কি ক'রে তৈরী করতে হবে শিরীষ কাগজ তৈরী করার কথায় তা তোমাদের বলব। প্যারিস প্লাষ্টার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকে হয়ত এটা দেখে থাকবে। হাত-পা ভেঙ্গে গেলে ডাক্তাররা এই প্লাষ্টার অব প্যারিস দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন। শিল্পীরা আবক্ষ মূর্ত্তিও তৈরী করেন এই প্যারিস প্লাষ্টার দিয়ে। জিনিসটা সিমেণ্টের মতই, তবে দেখতে বেশ সাদা।

হাঁ, যা বলছিলাম।

কাগজটা খুব কুচি কুচি ক'রে কেটে হামান-দিস্তায় কি ঢেঁকিতে বেশ ক'রে কুটে নাও। তারপর সেগুলো ঐ কাগজের প্রায় তিনগুণ জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে আগুনে ফুটিয়ে নাও। তারপর জল থেকে কাগজগুলো ছেঁকে তুলে ওর সাথে অল্প অল্প ক'রে কাগজের চার-পাঁচগুণ পাতলা এবং গরম আঠা ঘুটে ঘুটে মিশিয়ে দাও। এইবার প্যারিস প্লাষ্টারের গুঁড়া মিশাতে হবে। কাগজের ঐ মণ্ডের আট-নয়গুণ মিশাতে হবে প্যারিস প্লাষ্টার। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিরীষ মিশান হলে পরে সবখানি প্যারিস প্লাষ্টার মিশাতে হবে না। ঐ দুটি পর পর ক্রমে মিশাতে হবে। শিরীষ মিশিয়ে খানিকক্ষণ ঘুটে নিয়ে পরে প্লাষ্টার দেবে—তারপর খানিকক্ষণ নিয়ে আবার শিরীষ দেবে। এই ভাবে সবখানি শিরীষ এবং প্লাষ্টার মিশান হলে দেখা যাবে কাদার মত তাল তাল পাকিয়েছে জিনিসটা। ওটাকেই বলা হয় পেপিয়ার মেশি।

এই মেশির সঙ্গে আবার বিভিন্ন রং মিশিয়ে জিনিসটাকে আরও সুন্দর করা চলে। তারপর ওটা নরম থাকতে থাকতে, ও দিয়ে পেপার ওয়েট, বোতাম, পুতুল, কাপ-ডিস্, ট্রে—

যা ইচ্ছে করতে পার। এক ঢেলা নরম মেশির ওপর একটা ভাল পুতুল কি যে কোনও জিনিসের ছাঁচ তুলে ওটা শুকিয়ে শক্ত পাথরের মত হয়ে গেলে, ওর থেকে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করা যেতে পারে।

ফানুস

উত্তাপ লাগলে বায়ু হাল্কা হয় এবং বায়ুর ধর্ম্মই এই যে, হাল্কা হয়ে ওটা ওপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করে।

ফানুসের ব্যাপারটাও এই। যে ভাবে বাঁশের শলা দিয়ে ঘুড়ি তৈরী করে, সেইভাবে একটা কাঠামো (ক) তৈরী ক'রে নাও। তারপর ওটাকে রঙিন পাতলা কাগজ দিয়ে মুড়ে নাও (খ)। এইবার নীচের দিকে একটা টিনের হাল্কা ল্যাম্প (গ) জ্বেলে দাও।
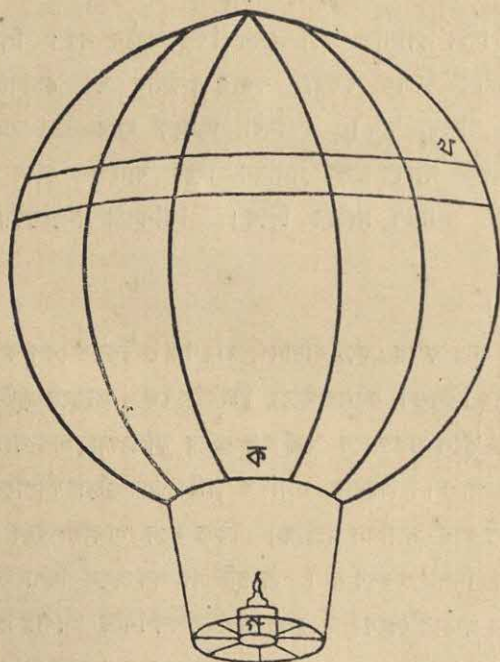
উত্তাপে কাগজের ভেতরের বাতাসটা হাল্কা হয়ে ঐ ফানুসটা ক্রমে ওপরের দিকে উঠে যাবে। ওপরে উঠে ফানুসটা বেশী বাতাস থাকার জন্যে বা প্রদীপটা ঠিক কেন্দ্রস্থলে না বসাবার জন্যে যদি কাৎ হয়, তা'হলে কিন্তু কাগজটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

খেলনা-ঘর

এ পর্য্যন্ত আমি তোমাদের খেলনা তৈরীর কথাই ব'লে এসেছি—খেলনা-ঘরের কথা কিছু বলি নি। আমার এই ভুল ধরিয়ে দিয়েছে আমার এক অচেনা দূরের পাঠিকা—কুমারী নমিতা।

খেলনা-ঘর কি ক'রে তৈরী করা যায় নমিতা জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠিয়েছে আমার কাছে।

ঘর তৈরী আজকাল মহাসমস্যা। সবই দুষ্প্রাপ্য। তার ওপর আর একটা প্রশ্ন আছে রুচির। কার কি রকম ঘর পছন্দ হবে দূর থেকে তা বলা শক্ত।

বড় এঞ্জিনীয়ারকে বাড়ীর নক্সা দিতে বললে তিনি কিন্তু আগেই জিজ্ঞাসা করবেন—কতর মধ্যে করতে হবে এবং কোন্ জায়গায় করতে হবে? আমাদের খেলনা-ঘরে কিন্তু ঐ দুটি প্রশ্নই অবান্তর; কারণ, আমাদের খেলনা-ঘরে এক পয়সাও খরচ নেই এবং তার জায়গারও কিছু ঠিক নেই। আমাদের খেলনা-ঘর ফাঁকা জায়গাতেও হতে পারে আবার ঘরের মধ্যেও হতে পারে—তা স্থায়ীও হতে পারে, আবার অস্থায়ী অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় এমনও হতে পারে।

ফাঁকা জায়গায় খেলনা চালা-ঘর এইভাবে তৈরী করা যেতে পারে—

এতে চাই—১। খুঁটি—বাঁশের সোজা কঞ্চি বা কোনও কাঠি; ২। চাল—বাঁশের কঞ্চি, সুতো ও খড়; ৩। বেড়া—বাঁশের কঞ্চি ফেড়ে নিয়ে তার ওপর মাটির প্রলেপ।

খড়ের ঘর
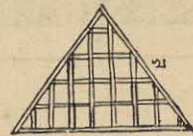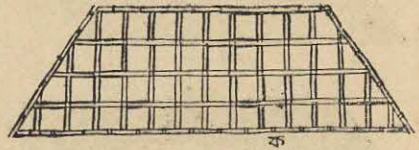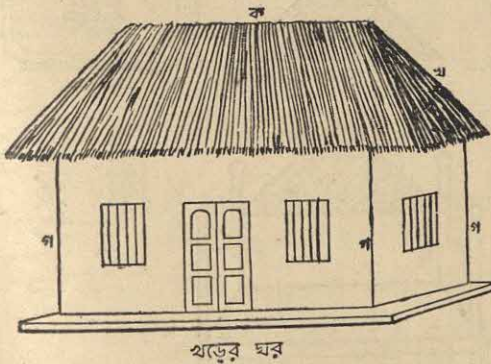
দু'খানি (ক) এবং দু'খানি (খ) চাল বেঁধে নিয়ে খুঁটির (গ) ওপর তুলে দিতে হবে: তারপর বেড়া। সুবিধামত যে কোনও জিনিস দিয়েই খেলনা-ঘরের বেড়া করা যেতে পারে। কঞ্চি একসঙ্গে বেড়ার মত বেঁধে নিয়ে তার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়েও কাজ চলতে পারে।

পিচবোর্ডের বাড়ী—চাই কতকগুলো পিচবোর্ডের বাক্স। একটা পিচবোর্ডের বড় বাক্সকে

উপুড় ক'রে বসাও। এটা হবে ঘরের ভিত (ক)। ওর ওপর কাঠি পুঁতে নিয়ে তার সঙ্গে ছোট পিচবোর্ডের বাক্স বেঁধে নিতে হবে। এইগুলো হবে ঘর। এই ঘরগুলো প্রয়োজনমত সূঁচ-সুতো দিয়ে বা কাগজ এঁটে তৈরী করা চলে। ছোট বই বা এক্সারসাইজ খাতার মধ্যে যে লোহার কাঁটা থাকে ওগুলো দিয়েও পিচবোর্ডের সঙ্গে পিচবোর্ড এঁটে দেওয়া যায়। বাড়ীটিকে ইচ্ছা-মত বাংলো বা দোতালা, তিন-তালাও করা যেতে পারে। টিন বা ঢেউ-তোলা এ্যাস্‌বেষ্টসএর কাজ দেখাতে হলে ওষুধের ফাইলে যে ঢেউ-তোলা পিচবোর্ড পাওয়া যায় ঐগুলো দিয়েই কাজ হবে। রঙিন কাগজ ও রাংতা দিয়ে বা চুণকাম ক'রে বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা চলে। জানালা, দরজাও পিচবোর্ড কেটে করতে হবে।
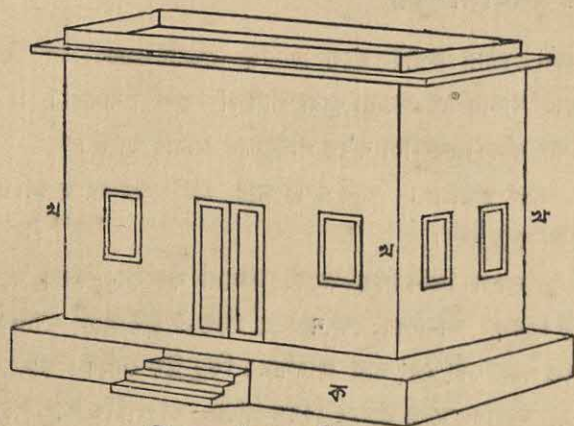
পিচবোর্ডের বাড়ী

খ১ খ২ ছ

খ১ খ২ চ

বড় টেবিল

সোফা
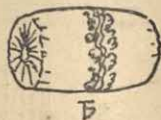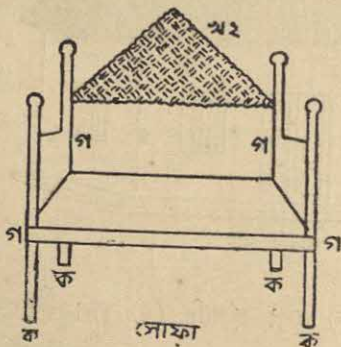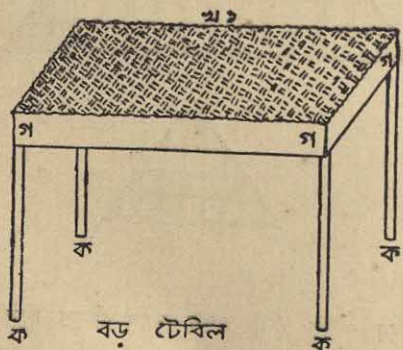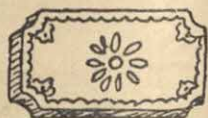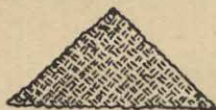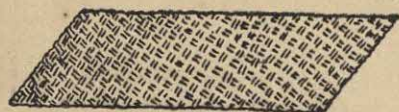
ঘর সাজানো—আধুনিক ধরনে ঘর সাজাতে হলে চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি চাই। এগুলোও সহজে তৈরী করা যেতে পারে।

এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস—

সরু বেত, শীতলপাটির অংশ বা বেত দিয়ে অনুরূপ তৈরী (খ), স্থঁচ, স্থতো ও খুব ছোট পিন।

(ক) চিহ্নিত পায়াগুলো বেতের টুক্‌রো বা ঐরূপ কোনও নরম কাঠ দিয়ে তৈরী ক'রে (গ) চিহ্নিত স্থানে ছোট পিন বা স্থতো দিয়ে এঁটে নিতে হবে৭

সকলের শেষে আসবাবগুলোতে একটা রংয়ের পালিস দিয়ে নিতে পারলে ওর সৌন্দর্য্য বাড়বে।

খেলনা সোফার গদি (ছ) বা তাকিয়া বালিশ (চ) সকলেই করতে পারে। দর্জ্জির দোকানের রঙিন কাপড়ের টুকরোর মধ্যে তুলো পুরে সেলাই ক'রে নিলেই ওটা তৈরী হবে।

শিরীষ কাগজ তৈরী

হাতের কাজে—বিশেষ ক'রে কাঠ দিয়ে তৈরী জিনিষের জন্য শিরীষ কাগজ খুব দরকার লাগে। তোমরা সকলেই শিরীষ কাগজ দেখেছ নিশ্চয়। কাঠের জিনিস পালিশ করতে, মরচে তুলতে এর প্রয়োজন হয়।

শিরীষ কাগজ তৈরী করবার জন্য দরকার কাচভাঙ্গা, মোটা ও শক্ত কাগজ আর শিরীষ। শিরীষ দিয়ে আঠা তৈরী হয়। ওটা বাজারে কিনতে পাবে।

ভাঙ্গা কাঁচ জোগাড় হলে ওগুলো একটা হামানদিস্তার মধ্যে ফেলে গুঁড়ো ক'রে নাও। তারপর একটা ভাল জালের ছাঁকনি দিয়ে কাঁচের গুঁড়োগুলো ছেঁকে নাও ; ওর মধ্যে যেন মোটা দানা না থাকে।

এইবার যে মোটা কাগজকে শিরীষ কাগজ তৈরী করবে, সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ঠিক ক'রে ফেল।

তারপর শিরীষ কিনে এনে সামান্য জলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ওটা আঠা আঠা মত হলে উনানে গলিয়ে নিতে হবে। এজন্য একটা হাঁড়িতে জল নিয়ে সেটা উনানে চাপাও। জল যখন ফুটবে, তখন শিরীষের পাত্রটি ঐ ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দাও। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় উনানে রাখলেই জলের বাষ্পের উত্তাপে শিরীষটা গলে পাতলা আঠার মত হবে।

এইবার নামিয়ে ব্রাসের সাহায্যে ঐ তৈরী আঠা পুরু কাগজে পাতলা ক'রে মাখিয়ে দাও। তারপর কাঁচের গুঁড়োগুলো ওর ওপর বেশ ক'রে ছড়িয়ে দাও। এখন একটা কাঠের বেলনা দিয়ে

লুচি বেলার মত ঐ কাগজের কাচগুঁড়োর ওপর কিছুক্ষণ চাপ দিলেই গুঁড়োগুলো সমানভাবে কাগজের ওপর আটকে যাবে। বেলনার নীচে পাতলা কাগজ দিয়ে নিলে কাচের গুঁড়ো বেলনার গায় আটকে যাবে না। এরপর ওটা শুকিয়ে নিলেই শিরীষ কাগজ তৈরী হয়ে গেল।

খোকন-কাঁদে বাঁশী

আগে এক রকম জাপানী খেলনা-পুতুল বিক্রী হ'ত। ওটাকে হাত দিয়ে চিৎ বা উপুড় করলেই ওর থেকে প্যাঁ-প্যাঁ ক'রে শব্দ হ'ত।

আমরাও সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিস দিয়ে ঐ ধরনের বাঁশী তৈরী করতে পারি।

আধহাতের কিছু কম লম্বা একখানি পাতলা পিচবোর্ড সমান দুই ভাঁজ ক'রে নাও—যেন ওপর-নীচে উভয় দিকের (১) চিহ্নিত স্থান এক সঙ্গে মিলিত হয়।

ভাঁজকরা এই পিচবোর্ডটিকে প্যাকিং কাগজ দিয়ে এমন ক'রে ভাঁজ ক'রে এঁটে দাও—যেন হারমোনিয়ামের 'ব্লোর' মত ওর দ্বারা বাতাস যাওয়া-আসা করতে পারে।
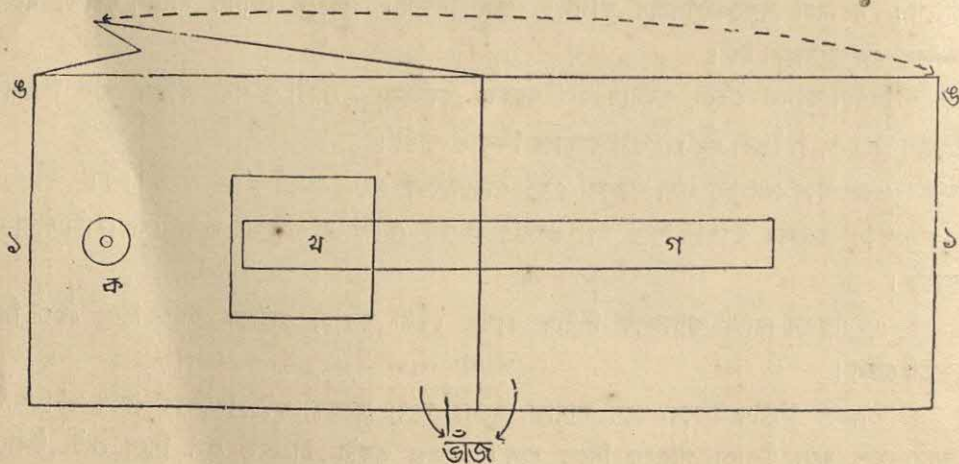
তারপর ঐ পিচবোর্ডের মাঝামাঝি জায়গায় ছিদ্র ক'রে (ক) চিহ্নিত টিনের চাকতি লাগিয়ে ওটা পাতলা রংয়ের কাগজ দিয়ে এঁটে দাও।

এই চাকতিটাই কিন্তু বাঁশী বাজবার আসল কারণ। কাজেই এই চাকতিটার কথাই আগে ব'লে নেওয়া যাক্।

একটা ছোট গোল টিনের চাকতির মাঝখানে ছিদ্র ক'রে তার চতুর্দ্দিকে ভাঁজ তুলে দাও।

তার মধ্যে আর একটা অনুরূপ ছিদ্রযুক্ত চাকতি বসাও। তারপর নীচের চাকতির ভাঁজ এঁটে দাও। উভয় ছিদ্র যেন ঠিক মুখোমুখী পড়ে এবং এপার-ওপার ছিদ্র দেখা যায়। এখন এই ছিদ্রে ফুঁ দিলে বাঁশীর মত বাজবে।

এইরূপ চাকতি-বাঁশী তৈরী অবস্থায় বাজারে কিনতেও হয়ত পাওয়া যায়।

এইবার ঐ (ক) চাকতি বাঁশীটার কাছ থেকে একটা চেপ্টা কাঠি (বাঁশ বা কাঠের) কাগজ দিয়ে এঁটে নাও ; (খ) (গ) এর খ অংশ থাকবে পাতলা কাগজে আঁটা।

তারপর ভাঁজকরা কোণের দিকে পিচবোর্ডটায় একটা কিছু ভারী জিনিস এঁটে দাও। মাটির রঙিন পুতুলের চ্যাপ্টা আকারের মাথা কাগজ দিয়ে এঁটে দিলেই সুদৃশ্য হবে।

(গ) হচ্ছে বাঁশীটা ধরবার হাতল। এই হাতল রঙিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে নিলে আরও ভাল।

এইবার (গ) হাতল ধ'রে ওটাকে ওপর-নীচে নাড়া দিলেই প্যাকিং কাগজের ভাঁজে বাতাস ঢুকে ঐ চাকতির ভেতর দিয়ে বাতাসটা বেরিয়ে যেতেই পোঁ-পোঁ ক'রে সুন্দর শব্দ হবে।

চোঙের মধ্যে রংয়ের খেলা

যে সব জিনিস সাধারণতঃ ফেলে দেওয়া হয়—তার থেকেই এই সুন্দর খেলনাটি তৈরী করা যেতে পারে। রঙিন কাচের চুড়ি ভেঙ্গে গেলে তা দিয়ে আর লোকে কি করবে? তেমনি কাচ বা কাগজের টুকরোও সাধারণতঃ আমাদের প্রয়োজনে আসে না; কিন্তু এর থেকে কেমন সুন্দর দেশী খেলনা তৈরী হতে পারে দেখ।

যে সব দোকানে কাচ দিয়ে ছবি বাঁধানো হয়, সেখানে কাচ থেকে ছবির জন্য প্রয়োজনীয় অংশটা কেটে নেওয়ার পর অবশিষ্ট ১ ইঞ্চি কি ১½ ইঞ্চি চওড়া কাচের লম্বা ফালি প্রায়ই অব্যবহার্য্য হয়ে প'ড়ে থাকে। যেখানে বই বা খাতাপত্র বাঁধানো হয়, সেখানেও দেখা যায়—সরু সরু কাগজ স্তূপাকার হয়ে রয়েছে।

এই সব রঙিন কাচের ভাঙ্গা চুড়ি, কাচের ফালি এবং কাগজের অব্যবহার্য্য সরু ফালি সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেকটি খেলনার জন্যে লাগবে—তিনখানি ১ বা ১½ ইঞ্চি গোল কাচ, তিন খানি ৫ বা ৬ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি চওড়া সাদা কাচ এবং টর্চলাইটের খাপের আকারে একটা মোটা কাগজের চোঙ আর বিভিন্ন রংয়ের কতকগুলো কাচের ভাঙ্গা চুড়ি।

যে দোকানে ছবি বাঁধানো হয় সেখান থেকেই কাচের ফালিগুলো ৫ বা ৬ ইঞ্চি ক'রে কেটে নেওয়া যেতে পারে। কাচকে গোল ক'রে কাটা একটু শক্ত—সেজন্য যারা ছবি বাঁধায় তাদের সাহায্য নেওয়া মন্দ নয়। কাচকে সরলরেখায় কাটা সোজা। পর পৃষ্ঠার প্রথম চিত্রে একখণ্ড কাচকে সরলরেখায় কেটে গোল করার পদ্ধতিটা দেখানো হয়েছে। কাচের কারখানা (factory) থেকেও গোল কাচ খুব সহজে পাওয়া যেতে পারে—যদি এই খেলনার চাহিদা হয়।

তারপর ?—তারপর কাজ অতি সহজ।

কাগজের চোঙ্গের মধ্যে ঐ পাঁচ-ছয় ইঞ্চি কাচ তিনখানি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন ওদের মুখের কাছে ত্রিভুজের মত হয়! চিত্রে ঐ তিনখানি কাচ—ক, খ এবং গ চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে। তারপর চোঙ্গটির মোটা কাগজ ও ঐ কাচের মাঝখানে যে ফাঁক, সেখানে কাগজের সরু ফালি গুঁজে দিতে হবে যাতে কাচগুলো বেশ এঁটে থাকে। এইবার চোঙ্গের এক প্রান্তের এক ইঞ্চি দূরে একখানি গোল কাচ (২) বসিয়ে কতকগুলো বিভিন্ন রংয়ের কাচের ভাঙ্গা চুড়ি (৬) সেখানে দেওয়া হ'ল। তারপর আর একখানা গোল কাচ (১) চোঙ্গটির মুখে বসিয়ে অনুরূপ আর একখানি গোল কাচও অপর মুখে (৩) বসাতে হবে। এখান থেকে

চোঙ্গের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঐ ভাঙ্গা চুড়িগুলোকে দেখতে খুব চমৎকার লাগবে। বিভিন্ন রং পর পর এমনভাবে দেখা যাবে যেন কোনও সুনিপুণ হাতে সেগুলো সাজিয়ে দিচ্ছে!

বলা বাহুল্য, ঐ তিনখানা কাচের জন্যই রঙিন চুড়ির খণ্ডগুলো প্রতিবিম্বিত হয়ে অমনি
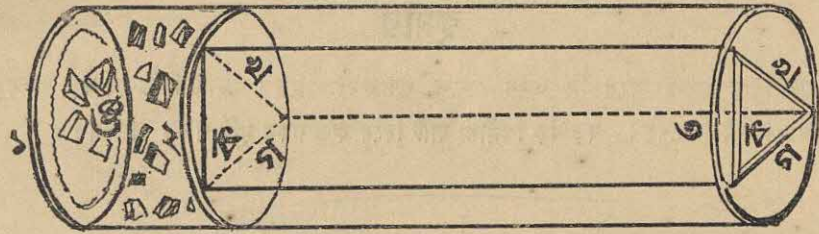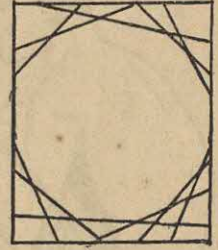
দেখায়। কিন্তু নিজ হাতে যারা এ খেলনা তৈরী করে নি বা এই খেলনার ভেতরকার ব্যাপার যারা জানে না, তাদের কাছে এটা খুবই আশ্চর্য্য মনে হবে।

মেলায় যারা ম্যাজিক খেলা দেখায়, তারাও এইরূপ কাচের সাহায্যেই নরমুণ্ডের খেলা, একটা লোকের তিনটে মাথা এইসব অদ্ভুত জিনিস দেখিয়ে থাকে!

মাটির খেলনা

কুমীর

মাটি নিয়ে খেলা করে নি এমন ছেলে খুব কমই আছে। মাটি দিয়ে যে কত রকম খেলনা হতে পারে তার অবধি নেই। বড় বড় শিল্পীরা মাটি দিয়ে কত রকম মূর্ত্তি গ'ড়ে থাকেন !
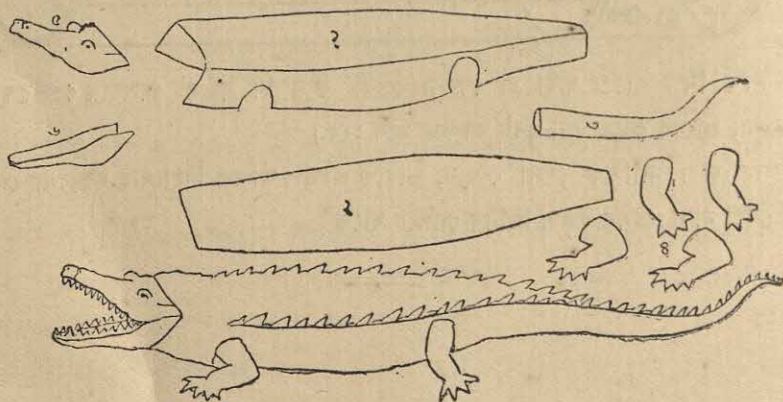
এখানে বাঁশ, দড়ি, খড় এবং রং-চং বাদ দিয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা কি ক'রে কেবল মাত্র মাটির সাহায্যে অতি অল্প সময়ে খেলনা তৈরী করতে পারে তাই বলা হবে।

মাটির খেলনার প্রথম কথা হচ্ছে—ভাল মাটি চাই। ভাল মাটি অর্থে এখানে বুঝতে হবে

বেলে মাটি নয়, এটেল বা দো-আঁশলা মাটি। মাটিতে বেশী বালি থাকলে খেলনাটা সহজেই ভেঙ্গে যাবে।

কুমীর তৈরী করতে হলে মাটি বেশ চটকে নিয়ে কুমীরের পিঠ (১), পেট (২), লেজ (৩), পা (৪), মুখের হাঁ (৫), (৬) আগে তৈরী ক'রে নিতে হবে। তারপর পেটটিকে নীচে রেখে ওর যথাস্থানে পা এবং মুখের হাঁ রেখে ওপরের পিঠ (১) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কুমীরের লেজে ও পিঠে কাঁটা থাকে। এই কাঁটা ও দাঁতের বদলে লাইন ক'রে ধান পুতে দিলেই হবে। তারপর কুমীরটাকে অল্প অল্প রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই হ'ল।

কাছিম

কাঁচা মাটি দিয়ে কাছিম তৈরীও খুব সোজা। কুমীর তৈরীর মতই কাছিমের পিঠ (১), বুক (২), পা (৩) এবং শুঁড় (৪) আগে তৈরী ক'রে নিয়ে বুকটাকে (২) পেতে তার ওপর
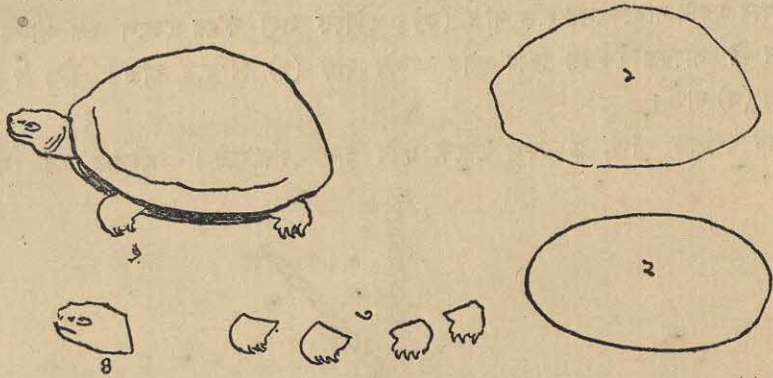
যথাস্থানে পাগুলো ও শুঁড়টা সন্নিবেশ ক'রে পিঠ (১) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দুইটি ছোট ছোট মাটির পুটুলি শুঁড়ের মাথায় লাগিয়ে দিলে কাছিমের চোখ হবে।

তারপর কাছিমটাকে অল্প অল্প রৌদ্রে শুকিয়ে বা উনানের আগুনে পুড়িয়ে নিলেই হ'ল।

নারকেল দড়ির বাটি

প্রথমে একটা নারকেলের দড়ি নাও (ক) ; ওটাকে লম্বা ক'রে ফেলে ওর মাঝখানের (ঙ) পাক খুলে ঐ পাকের ভেতর দিয়ে আর একটা দড়ি (খ) চালিয়ে নাও। ঠিক ঐ ভাবে আর একটা দড়ি (গ) নাও।

এখন দেখতে পাচ্ছ, ঙ কেন্দ্র থেকে ছ'টা বাহু বেরিয়েছে। এইবার এর যে কোনও
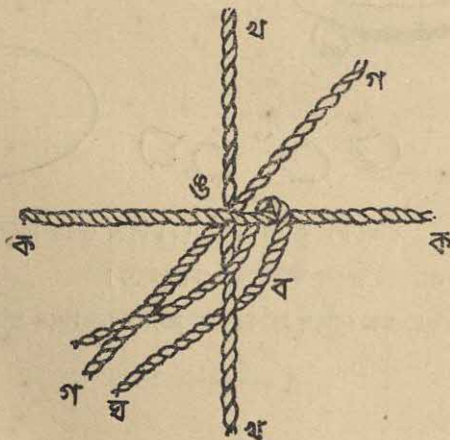
একটি বাহুতে আর একটা লম্বা দড়ি পরিয়ে নাও,—যেমন ধর, ক বাহুকে ভেতরে রেখে ঘ দড়ি দু'ভাঁজ ক'রে নেওয়া হ'ল।

তারপর 'ঘ' র ঐ বাহু দুটিকে এমনভাবে ওপর-নীচে ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাকিয়ে যাও যেন, গ, খ, ক বাহুগুলো প্রত্যেকে ঐ ঘ-এর দু' বাহুর পাকের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে পড়ে।

এইভাবে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনতে বুনতে দেখবে, একটা সুন্দর বাটি বা কাপ তৈরী হয়েছে।
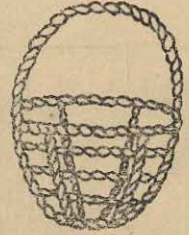
এ দিয়ে কত কি করা যেতে পারে। কোথায়ও কিছু নিতে হলে—যেমন, মাছ, মাংস কি ডিম এই ভাবে দড়ি কি লতা দিয়ে একটা পাত্র তৈরী ক'রে সহজেই নিতে পার। বিহার অঞ্চলে গরুর ছোট বাছুরের মুখে নারকেলের দড়ি দিয়ে এমনি একটা বাটির মত ক'রে লাগিয়ে দেয়—তাতে ছোট বাছুর মাটি খেতে পারে না।

বেত, লতা, তার বা কঞ্চি দিয়ে ঠিক এই কৌশলেই ঝুড়ি তৈরী হয়। পাত্রটি বড় করতে হলে বাহুগুলোর সংখ্যাও বাড়িয়ে নিতে হবে।
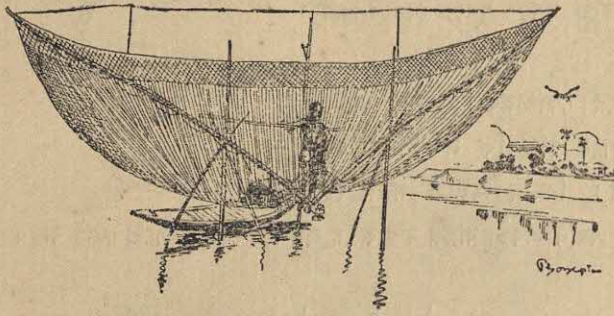
জাল

জাল তোমরা সকলেই দেখেছ। জাল আমাদের কত কাজে দরকার হয়—আম পাড়তে লগির মাথায় জালের থলে চাই, তা'ছাড়া পাখী ধরতে, মাছ ধরতে, বল খেলতে, কত রকম থলে তৈরী করতে, এমন কি, আজকাল মেয়েদের চুল বাঁধতে পর্য্যন্ত জালের দরকার।

সব জালই অবশ্য এক রকমের নয়। প্রয়োজনভেদে তাদের স্থতোরও পার্থক্য হয়ে থাকে।

কিন্তু জাল বলতে সাধারণতঃ আমরা মাছ ধরার জালের কথাই মনে করি। জাল থেকেই ত যারা মাছ ধরে তাদের নাম হয়েছে জেলে। জেলেদের আর এক নাম ধীবর। ধী অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তিতে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব'লেই ওদের এই নাম হয়েছে। হাঁ, মাছ ধরতে বুদ্ধি লাগে বৈ কি! জলের নীচে মাছ বেড়াচ্ছে খেলা ক'রে আমাদের চক্ষুর অগোচরে, তাদের ধরা কি চারটিখানি কথা?

জাল বুনাও তাই। বুদ্ধি লাগে জাল বুনতে, কিন্তু একবার কৌশলটা জানতে পারলে বুনা খুব সহজ।

খোরচে
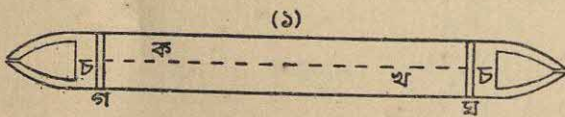
বুনতে চাও তোমরা জাল? তবে শিখে নাও পদ্ধতিটা। প্রথমে কি কি চাই দেখ।

প্রথমে চাই একটা খোরচে। এর মধ্যে স্থতো পুরে নিয়ে জাল বুনার সময় ঐ স্থতো খরচ ক'রে যেতে হয় ব'লেই বোধ হয় এর নাম হয়েছে খোরচে। দুই টুকরো বাঁশের বাখারী (ক, খ) সমানভাবে কেটে নিয়ে বেঁধে নিতে হয় (গ, ঘ)-এর 'চ' চিহ্নিত গোলাকার মুখ দুটিতে—এমুখ-ওমুখ লম্বাভাবে স্থতো জড়ান থাকে। খোরচের আকৃতিটা ওপরের ছবিতে দেখ।

আর লাগে একটা পাশকাঠি। এটা এমন কিছুই নয়—জালের ঘরগুলো ঠিক রাখবার জন্য একটা বাঁশের চ্যাপ্টা কাঠি মাত্র; এর একটা দিক একটু সরু মত থাকবে—যাতে ওটাকে জালের ঘর থেকে সহজেই ঐ সরু মুখ দিয়ে বার ক'রে নেওয়া যায় (পাশের চিত্র দেখ)।
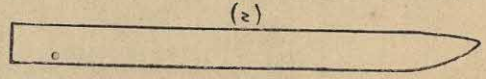
পাশ কাঠি

এ ছাড়া 'টাকু' দিয়ে সুতো পাকাতে হয় এবং লাটাইতে (৪) সুতো পাকাবার আগে ফেটির সুতো জড়িয়ে নেওয়া হয়।

ফেটির সুতো ৩ খেই, ৫ খেই বা ৭ খেই—প্রয়োজন অনুসারে তুলে নিয়ে লাটাইতে জড়াও। তারপর ঐ লাটাইসহ সুতোগুলো জলে ভিজাও।

ঐ ভিজে সুতো লাটাই থেকে তুলে টাকু দিয়ে পাকাও। চার-পাঁচ দিন পরে ঐ পাকানো সুতো খোরচেতে জড়াও।

টাকু বা বড় তকলি
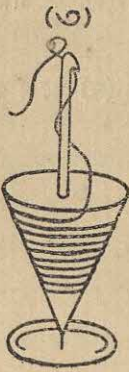
জো-তোলা: জালের ফাঁক বা ঘর অনুসারে পাশকাঠি তৈরী করতে হবে।

একগাছি সুতো নিয়ে তার দুই মুখ এক ক'রে গিঁট দিয়ে নাও। এই সুতোটার নাম ধর (ক), খোরচের কাঠিতে যে সুতো আছে তার নাম মনে কর (খ)।

কেবল 'জো-তোলা' অর্থাৎ গোড়াপত্তনের জন্য আরও একটা সুতো আর একজনকে ধরতে দাও। এই সুতোটার নাম হোক (গ)।

এখন এই (গ) সুতোর একটা দিক্ (ক) সুতোর দুই মুখের গিঁটটার দিক্ উল্টো দিকে একটা প্রান্ত রেখে অর্থাৎ খানিকটা বের ক'রে রেখে বাঁধ। তারপর (খ) সুতোর প্রান্ত ঐ বের ক'রে রাখা (গ) সুতোর প্রান্তের সঙ্গে বাঁধ।

(ক) সুতোটা ব'সে দুই পায়ের দুই গোড়ালী পরস্পর ঠেকিয়ে দুই বুড়ো আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে আটকাও।

বাঁ হাত দিয়ে পাশকাঠি ধর এবং ডান হাতে খোরচে-কাঠিটা নাও। পাশকাঠির নীচে দিয়ে খোরচে চালিয়ে ওর ওপর দিক্ দিয়ে তুলে নিয়ে এস। ঐটাই আবার (ক) সুতোর নীচে দিয়ে এবং (ক) সুতোর আংটার ভেতর দিয়ে তুলে নাও। ডানদিক থেকে (গ) সুতোর ওপর দিয়ে আবার (ক)-এর যেখান দিয়ে এসেছিল সেখান দিয়েই (পাশকাঠির তলায় আঙ্গুল রেখে) টেনে নাও।

এইবার (গ) স্থতোয় ঢিল দাও। এখন (গ) স্থতো ও (খ) স্থতো মিলে পাশকাঠির সম্মুখে একটা চৌকা ফাঁস বা ঘরের মত তৈরী হ'ল।

এইবার ঐ 'ঘর'টা আঁটবার জন্য পাশকাঠির নীচে বাঁ হাতের মধ্যের আঙ্গুল পাশকাঠির সঙ্গে

লাটাই
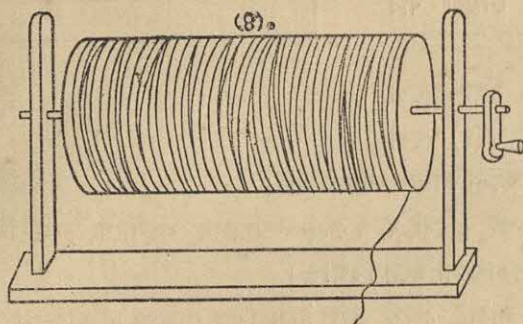
খোরচের স্থতোটা চেপে ধ'রে খোরচের মুখ সম্মুখের ঘরের মধ্যে ঢুকাও এবং খোরচের স্থতোর ডান-দিকের ফাঁকের মধ্য দিয়ে খোরচেটা তুলে নিয়ে টান দাও।

এখন দেখা যাচ্ছে, (গ) স্থতোটা (ক) স্থতোর নীচে গিয়েছে; সেইজন্য এবার (খ) স্থতো বাঁ দিক্ দিয়ে (গ) স্থতোর নীচে যাবে—তারপর পূর্ব্ববৎ বুনে যাও।

আমাদের দেশে যে সব তালপাতার পাখা (জ) বিক্রী হয় তার স্থায়িত্ব খুব কম। তার কারণ, তালের পাতা বা ডাটাকে উপযুক্ত ক'রে নেওয়া হয় না। কাঠকে 'সিজনড' অর্থাৎ রৌদ্র-বৃষ্টি সইয়ে নিয়ে তবে তা দিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করা উচিত,—তালপাতাকেও তেমনি 'পাকিয়ে' নিতে হয়।

আমরা সচরাচর যে সব তালপাতার পাখা ব্যবহার করি, ওগুলো কাঁচা তালপাতাকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী করে। তার ফলে ঐ পাতা অল্প দিনেই ফেটে যায়। পাখার উঁচু-নীচু ভাঁজ (ঞ) থাকে ব'লে, একটু চাপ লাগলেই ওটা ভেঙ্গে যায় এবং কম মজবুত স্থতো দিয়ে বাঁধা কাঁচা বাঁশের শলা (ট) দু'দিনেই যায় খুলে।

ট
ঞ
জ
ঝ

অবশ্য পাখার দোষ ছাড়াও—আমাদের পাখার অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির আরও কারণ আছে,—সেটা আমরা নিজেরাই। কাউকে মারতে হলে হাতের কাছে যদি পাখা থাকে, তা'হলে আর কিছু আমরা চাইনে। কাঁচা ডাঁটাকে শুকিয়ে নেওয়া যে হাতল (ঝ), তাতে আর কত সহ্য হতে পারে বল!

কিন্তু আমি এখানে যে তালপাতার কথা বলছি, সেটা একটু অন্যরকম। বাঙ্গালাদেশে এই ধরনের পাখা খুব প্রচলিত নয়। কৃষ্ণনগরের এক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে ওটা দেখলাম। তাঁরা বললেন, পাখাটার বয়স পনর-কুড়ি বৎসর ত হবেই!
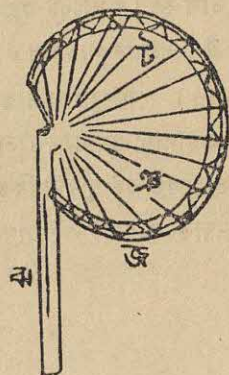
অথচ এই ধরনের পাখা তৈরী করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। গাছ থেকে একটু বয়স্ক—অর্থাৎ যা খুব কাঁচা বা সবুজ নয় এমন তালপাতা কেটে নিয়ে, ওটা দু-চার দিন গোবর-জলের মধ্যে রেখে দিতে হবে। তারপর পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে নিলেই হ'ল।

ডাঁটা বাদ দিয়ে পাতাগুলোকে প্রয়োজনমত আধ ইঞ্চি—সিকি ইঞ্চি ক'রে চিরে নাও। এইবার (ক) ছবি অনুযায়ী বুনানী দিয়ে একটা পাখা তৈরী কর।

(খ) হচ্ছে ওর বাঁশের কাঠির হাতল। বাঁশটাকেও পানেট—অর্থাৎ পাকা বাঁশ জলে ফেলে রেখে তারপর ওর থেকে যে কাঠি হবে, তাই দিয়ে পাখার হাতল তৈরী করা উচিত।
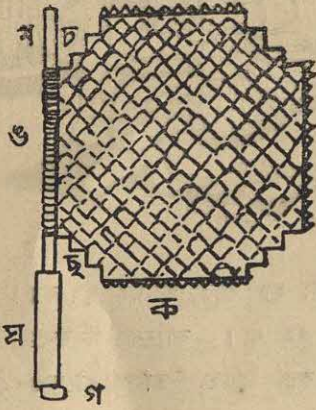
এর (খ) মুখটা চিরে নিয়ে তার মধ্যে পাখার ঐ বাঁ-দিকটা ঢুকিয়ে নিয়ে—পাকা এবং পানেট দেওয়া সরু বেতের ফালি দিয়ে ঐ কাঠি ও পাখা ভাল বুনানী ক'রে বাঁধতে হবে।

হাতলের গ প্রান্তে কাঠিটার একটা খাঁজ কেটে নেবে—যাতে বাঁশের চোঙ্গটি (ঘ) নীচে দিয়ে হাতলের কাঠি থেকে প'ড়ে না যায় এবং যাতে ওটা ঐ খাঁজে আটকে থাকে।

(ঘ) হচ্ছে একটি বাঁশের সরু চোঙ্গ। ওটার ভেতর আগে থেকে (খ) কাঠিকে পরিয়ে নিতে হবে। এই চোঙ্গটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে ঘুরালেই স্বচ্ছন্দে পাখাটা ঘুরবে। বলা বাহুল্য, চোঙ্গটাও বাঁশের পাকা কঞ্চির হবে এবং ওটাও পানেট ক'রে নিলে ভাল হয়। পানেট করা জিনিসে সহজে ঘুন ধরে না এবং ওটা টেকেও খুব।

হাঁ, এইবার পাখাটির চ ও ছ প্রান্ত সরু বেতের ফালি দিয়ে হাতলের সঙ্গে বুনানী ক'রে 'টানা' বেঁধে নাও। দেখবে কেমন সুন্দর একখানি পাখা তৈরী হয়ে গেল!

এই পাখা দুমড়ালেও ভাঙ্গবে না, কেউ পা দিয়ে মাড়ালেও চৌচির হবে না এবং কাউকে দমাদম পিটাতে হলেও এই পাখায় কিছুমাত্র সুবিধা হবে না,—সেজন্য অন্য কিছু খুঁজতে হবে! বিশেষ ক'রে এই শেষোক্ত কারণেই এই পাখার পরমায়ু বেড়ে যাবে অনেক দিন।

চামড়া দিয়ে বাঁধানো বইগুলোতে বর্ষার দিনে কেমন একট স্যাঁৎলা ধ'রে থাকে। পুরাতন বাঁধানো বইগুলোতে ত হাতই দেওয়া যায় না—চামড়াগুলো ফেটে চৌচির!—একটা হলদে রংয়ের গুঁড়া চামড়াগুলোর গায়ে জড়িয়ে আছে; মনে হয়, বেশী নাড়া-চাড়া করলে চামড়াগুলো বুঝি খসে আসবে হাতে!

চামড়ায় বাঁধানো বইগুলোর এই রকম ছুরবস্থা দেখা যায় প্রায় সব লাইব্রেরীতেই।

এইসব বই একাধিক বার বাঁধানো খরচসাপেক্ষ। অনেক সময় ছু'বার ক'রে বাঁধাতে গেলে বইগুলো একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

এইজন্য রাসায়নিকেরা কয়েক রকম তেল ও গ্রীজ আবিষ্কার করেছেন। ওগুলো চামড়ায় বছরে ছু' একবার ক'রে মাখালে চামড়ার আঁশ (fibre)গুলো বেশ শক্ত থাকে—চামড়াটা টেকসই হয় এবং দেখতেও হয় সুশ্রী।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, হঠাৎ শতজীর্ণ মলাটে মালিশ মাখলে বিশেষ কাজ হবে না; বাইণ্ডিং-এর প্রথম থেকেই ওটা ব্যবহার করা দরকার।

চামড়ার এই বাইণ্ডিং সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর অনেকগুলো পালিশ (dressing) আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল এবং সহজ যেগুলো সেগুলো তৈরী করবার 'ফরমূলা' বা কোন্ জিনিস কতখানি লাগবে তার একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

১

নিটস্ ফুট অয়েল, বিশুদ্ধ ২০°c	২৫·০	ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস্	১৭·৫
জাপানী মোম—বিশুদ্ধ	১০·০	সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট, গুঁড়া	২·৫
ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার		৪৫·০	

২

ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস্	৩০·০	ক্যাষ্টর অয়েল	১২·০
বিশুদ্ধ জাপানী মোম	৫·০	সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট, গুঁড়া	৩·০
ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার		৫০·০	

৩

ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস্	৫০·০	নিটস্ ফুট অয়েল বিশুদ্ধ ২০°c	৩৫ ০
বিশুদ্ধ জাপানী মোম	১০·০	সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট, গুঁড়া	৫·০

৪

ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস্	৫৫·০	স্পারম (sparm) অয়েল	২৫·০
বিশুদ্ধ জাপানী মোম	১৫ ০	সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট, গুঁড়া	৫·০

৫

নিটস্ ফুট অয়েল, বিশুদ্ধ ২০°c	৫০ ০	ক্যাষ্টর অয়েল	৫০·০

৬

ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস্	৪০·০	নিটস্ ফুট ওয়েল, বিশুদ্ধ ২০°c	৬০·০

৭

পেট্রোল্যাটাম বা পেট্রোলিয়াম জেলী ১০০·০

পালিশের এই তেলগুলো তৈরী করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এক ও দুই নম্বরের জিনিস দুটি একই রকমে তৈরী করা যায়। ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার ও সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট ছাড়া সব জিনিসকে (ingredients) গলিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার আর একটা পাত্রে মিশানো প্রয়োজন। পাত্রটির মুখে ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তাপ দিতে হবে যাতে ক'রে ষ্টিয়ারেটটা গলে যায়। তারপর ঐ গলিত সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট ঐ দ্রবীভূত গ্রীজের সঙ্গে খুব ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। ওটা দেখতে হবে পাতলা দুধের মত। তারপর ওটাকে ঠাণ্ডা করলে বেশ একটা ঘন পালিশের মত হয়ে যাবে।

তিন ও চার নম্বরের পালিশটি তৈরী করতে সমস্ত জিনিস (ingredients) একসঙ্গে রেখে উত্তাপ দিতে হবে যাতে ক'রে একমাত্র সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট ছাড়া আর গুলো গলে যায়। তারপর ঐ মিশ্রিত পদার্থ একটা পাথর কি কাচের পাত্রে রেখে ঠাণ্ডা ক'রে নিতে হবে।

পাঁচ নম্বরের পালিশটি তৈরী করার হাঙ্গামা নেই মোটেই। সমান পরিমাণ নিটস্ অয়েল এবং রেড়ীর তেল মিশিয়ে নিলেই হ'ল।

ছয় নম্বরের পালিশ তৈরী করতে ল্যানোলিনটাকে আস্তে আস্তে গরম ক'রে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর নিটস্ ফুট অয়েল দিয়ে নাড়তে হবে ভাল ক'রে যাতে জিনিস দুটি বেশ মিশে যায়। তারপর ওটাকে ঠাণ্ডা ক'রে নিলেই হ'ল।

সাত নম্বরের পালিশটি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ পেট্রোলিয়াম জেলী বা ভেজেলীন ওষুধের জন্য যেটা ব্যবহৃত হয়, ওটাও ঠিক সেই রকম। এটার রং কতকটা সাদাটে হয়, এর কোন স্বাদ বা গন্ধ থাকে না।

আর একটা পালিশ বেরিয়েছে—অগ্নি-সংরোধক। মূল্যবান বইতে এই পালিশটি মধ্যে মধ্যে দেওয়া উচিত। পালিশটির ফরমূলা এই ঃ

সেলুলজ নাইট্রেট ফর ল্যাকুয়ার্স (ওজনে) (শতকরা ৩০ ভাগ এ্যালকোহল যুক্ত তৈরী)	১
মনোএথাইল এয়ার অব এআইলিন গ্লাইকোল	২
এথাইল একেটেট	৩
এন-বুটাইল এ্যালকোহল	১
টলুএন (Toluene)	৫
স্কাইলিন (Xylene)	২
ক্যাষ্টর অয়েল	½

এই পালিশটি পাতলা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। ইহা বাজারে 'রেডিমেড'ও কিনতে পাওয়া যায়। দোকানে ধাতু ও কাঠের জিনিসের অগ্নি-রোধক পালিশও বিক্রী হয়, সেগুলো কিন্তু বইয়ের চামড়ায় লাগালে ভুল করা হবে।

কাঠের আলমারী কি টেবিলে যে ভাবে পালিশ দেয়, এই সব পালিশও বাঁধানো বইয়ের চামড়ায় পাতলা ক'রে কয়েক ঘন্টা অন্তর অন্তর দিতে হবে।

খানিকটা পালিশ একসঙ্গে লেপটে থাকলে সেটা দেখতে সুন্দর হবে না, কার্য্যকরীও হবে না। ন্যাকড়া, তুলো বা তুলি ব্যবহার না ক'রে হাত দিয়েই বইয়ের চামড়ায় এইসব পালিশ দেওয়া বিধেয়।

———

কোন কোন দোকানে দেখা যায়, গাঢ় নীল কাগজের ওপর কত সব গহনা সাজিয়ে রেখেছে—হার, কানপাশা, চুড়ি এই সব। ঐ সব গহনার উপর আলোক প'ড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছে ওগুলো। দেখলে কারও সাধ্য নেই যে বলে, ওগুলো সোনার নয়! সোনার মত দেখতে অথচ দাম ওগুলোর কত কম!

লোহা, তামা ও জার্ম্মান সিলভার (অর্থাৎ তামা, দস্তা ও নিকেল মিশিয়ে যে ধাতু তৈরী হয়) প্রভৃতি কম দামী ধাতব দ্রব্য বা গহনা প্রভৃতির ওপর সোনা, রূপা প্রভৃতি দামী ধাতুর বৈদ্যুতিক উপায়ে যে মণ্ডন দেওয়া হয়, তাকে ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং বলে।

মনে কর, তুমি একটি তামার চুড়িকে সোনা দিয়ে মণ্ডন করবে:

প্রথমে তামার চুড়িটিকে পাতলা নাইট্রক কার্বোনেট (Na_2Co_3) গোলা জলে খুব ভাল ক'রে ধুয়ে নাও। তারপর ওটাকে একটা চিমটে দিয়ে তুলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। সাবধান, যেন চুড়িটিতে হাত না লাগে।

এইবার ঐ চুড়িটাকে একটা কাচের বাটির ওপর ঝুলিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখবে যেন চুড়িটি সম্পূর্ণরূপে বাটির ভেতরকার তরল পদার্থের মধ্যে ডুবে থাকে। বাটির মধ্যে যে তরল পদার্থ আছে ওটায় থাকবে—

গোল্ড ক্লোরাইড	১ ভাগ
পটাসিয়াম সায়ানাইড	১০ ভাগ
পরিষ্কার জল	২০০ ভাগ

এইবার একখণ্ড বিশুদ্ধ সোনা ও একটি ব্যাটারী দরকার। এই ব্যাটারী থেকে দুটো তার আসবে—একটি নেগেটিভ, আর একটি পজেটিভ। দুটো তারই ঐ তরল পদার্থের মধ্যে ডুবান থাকবে। যে দ্রব্যটির ওপর প্লেটিং করতে হবে—অর্থাৎ ঐ চুড়িটিকে রাখতে হবে নেগেটিভ তারের সঙ্গে এবং যে দ্রব্যটি দিয়ে প্লেটিং হবে—অর্থাৎ ঐ সোনার খণ্ডটি ঝুলান থাকবে পজেটিভ তারে। তারপর বিদ্যুৎ-কোষ থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে ঐ তামার চুড়ির উপর ধীরে ধীরে সূক্ষ্মাকারে সোনার কণা গিয়ে জমবে।

এরপর ঐ চুড়িটিকে রুজ দিয়ে পালিশ করলে ওটা সোনার চুড়ির মতই ঝক্‌ঝক্ করবে।

রূপালী রং করতে হলে নিম্নলিখিত তরল পদার্থগুলো মিশিয়ে নিতে হবে ঃ

সিলভার সায়ানাইড	১ ভাগ
পটাসিয়াম সায়ানাইড	২ ভাগ
পরিষ্কার জল	৫০ ভাগ
কারবন্ বাই সালফাইড	কয়েক ফোঁটা

এই শেষোক্ত তরল পদার্থটি মিশালে রূপালী রংয়ের খুব জৌলুষ হয়।

কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ওপর কিন্তু অন্য উপায়ে সিলভার প্লেটিং করতে হবে ; তার কারণ কাচ নন-কনডাক্‌টর অর্থাৎ ওর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হতে পারে না। অন্য উপায়ে কাচের ওপর রঞ্জন করা হয়। একটা পরিষ্কার টেষ্টটিউব নাও। তারপর ওর মধ্যে সিলভার নাইট্রেড ঢেলে তার সঙ্গে Rochell Salt জলে গুলে মিশিয়ে নিলে, একটা সাদা তলানী টেষ্টটিউবের তলায় পড়বে। এইবার ঐ তলানীর মধ্যে কিছু এ্যামোনিয়াম হাইড্রেড মিশিয়ে দিলে ঐ তলানীটা যাবে গুলে। তারপর ঐ টেষ্টটিউবটিকে কিছু সময় গরমজলে উত্তপ্ত করলে, অতি সুন্দর ভাবে টেষ্টটিউবের গায়ে রূপা জমে যাবে এবং ওটা চক্‌চক্ করতে থাকবে।

বিদ্যুতের সাহায্য না পেলেও রূপা দিয়ে রঞ্জন করা চলে। একটা পয়সাকে পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে নাও। এদিকে একটি পাত্রে কিছু সিলভার নাইট্রেড নিয়ে ওর মধ্যে কিছু পটাসিয়াম সায়ানাইড ঢালবার পর ঐ তরল পদার্থের তলানী পড়বে। তারপর আর কয়েক ফোঁটা পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে ঐ তলানীটি গলিয়ে নাও। এইবার পয়সাটি ওর মধ্যে ফেলে দাও। কয়েক ঘণ্টা রাখবার পর দেখবে, পয়সাটি আধুলির মত চক্‌চক্ করছে!

মাঘ মাস। রাত্রে একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। ওপরে একখানি মাত্র ঘর। এই ঘরে আমি শুয়ে আছি—অবশ্য স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ ভাবে—সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে। ভোর হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার সাদা মশারীর ওপর একটি নারকেল গাছের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণ ছায়া!—নারকেলের কান্দীগুলো পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

গাছটির ছায়া পড়েছে কিন্তু উল্টো। পূর্ব্বদিকের জানালাটি খুলে দিলাম। অনেকখানি আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। মশারীর কাপড়ের ওপরকার সে নারকেলগাছের ছবি আর দেখা গেল না। আবার জানালা বন্ধ করতেই, পূবদিকের বাগানের সেই নারকেলগাছের ছায়া আবার মশারীর কাপড়ে দেখা দিল।

উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালা খুলে দিলাম—এবারও গাছটি হ'ল অদৃশ্য!

কেমন ক'রে এই ব্যাপারটা ঘটল, এইবার তোমাদের বলছি।

আলোর ধর্ম্মই এই যে, তার গতিটা হচ্ছে সোজা। এই সোজা গতির জন্যেই নারকেলগাছটির ছায়া এসে পড়েছে উল্টোভাবে।

একটা উদাহরণ ধরা যাক্।

একখানা পিচবোর্ডে ছোট্ট একটা ছিদ্র ক'রে নেওয়া হ'ল (গ)। ঐ পিচবোর্ডখানিকে রাখা হ'ল—একটা জানালা-দরজা বন্ধ করা ঘরের মধ্যে, একটা মোমবাতির (ক) সম্মুখে।

পিচবোর্ডের অপর প্রান্তে থাকল একখানি পর্দ্দা (প)। ওটাকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন, ঐ পিচবোর্ডের ছিদ্রপথ দিয়ে আলোটা সোজা আসতে পারে।

দেখা যাবে, আলোক-শিখাটির উল্টো ছায়া পড়বে ঐ পর্দ্দায়। কারণ, ঐ আলোক-শিখার প্রত্যেক অংশটি একটা সরলরেখার আকারে ঐ ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করার ফলে ছায়াটা হয়ে যাবে উল্টো। মনে রাখতে হবে, ঐ ছিদ্রটা খুব বড় হয়ে গেলে ছায়াটা আর পড়বে না ঐ পর্দ্দায়।

এইবার ভোরের আলোককে ঐ মোমবাতি, ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জানালাটিকে পিচবোর্ড এবং মশারীকে পর্দ্দা ধরলে তোমরা এবার সহজেই বুঝতে পারবে—কি ক'রে নারকেলগাছের উল্টো ছায়া এল মশারীর ওপর।

ক্যামেরার ব্যাপারও ঠিক এই। ঘরটিকে ক্যামেরা, গাছটিকে যার ফটো তোলা হবে সেই বস্তু বা ব্যক্তি এবং মশারীর কাপড়টাকে ফিল্‌ম্ ধরলে—কি ক'রে ফটো তোলা হয় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারব।

তোমরা হয়ত ভাবছ, ফটোতে ত আমরা ছবিগুলো উল্টো দেখি না অর্থাৎ মানুষটার পা ওপর-দিকে এবং মাথাটা নীচের দিকে এমন ফটো ত দেখা যায় না।

দেখা যায় না তার কারণ, ঐ উল্টো ছবিটাই আমরা উল্‌টিয়ে ধরি। ফিল্‌ম্‌এর গায়ে ছবিটা
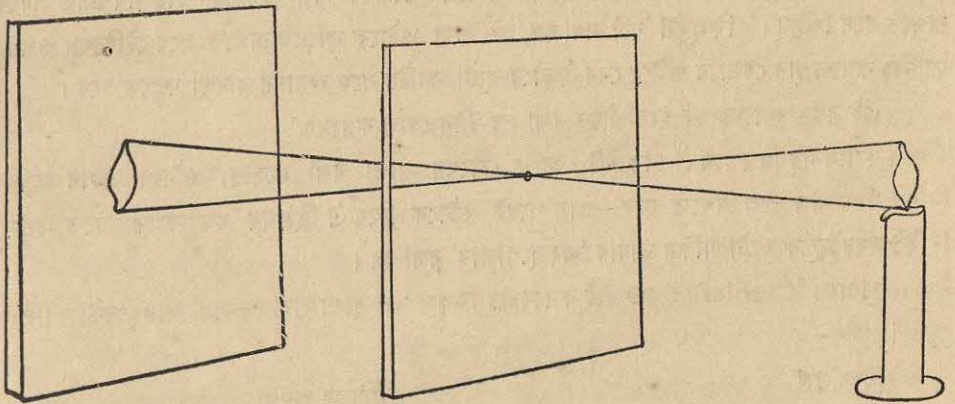
উল্টোই ওঠে—সেই ফিল্‌ম্‌এর ওপর দিকটা আমরা নীচের দিকে ক'রে ধরি বলেই, ছবিটা সোজা হয়ে যায়।

এইবার ক্যামেরা তৈরীর কথা।

তোমরা নিজেরাও ওটা তৈরী ক'রে নিতে পার, তবে ফিল্‌ম্‌এর জন্য কিন্তু তোমাদের দোকানে ছুটতে হবে। ফিল্‌মএর একটা সাধারণ মাপ নাও,—ধর যেমন ৪¼" × ৩¼" ফিল্‌ম্ তোমরা কিনে আনলে বাজার থেকে!

এখন তোমাদের যে ক্যামেরাটা হবে, তার সাইজটাও এই ফিল্‌ম্‌এর মাপে হওয়া চাই।

একটা শটীফুডের কাগজের কৌটা ঐ মাপের যদি পাও, ভালই। না হয়, শক্ত পিচবোর্ড কেটে ঐ রকম একটা বাক্স তৈরী ক'রে নিতে হবে—যেন বাক্সটির ভেতরে অন্ধকার হয়।

এখন বাক্সটির ঢাকনির বিপরীত দিকে সিকি ইঞ্চি চৌকো একটা টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে ঐ কাটা জায়গায় একখানা পুরু কালো কাগজ বেশ ক'রে আঠা দিয়ে এঁটে দাও।

এইবার এই বাক্স হ'ল ক্যামেরা অর্থাৎ অন্ধকার ঘর। এখন এর চোখ ফোটাতে হবে। জানালার গায়ে যেমন ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকার জন্য আলোর রেখা গাছের ছায়াকে এনে ফেলেছে মশারীর ওপর, তেমনি ঐ কালো কাগজের মাঝখানে পিন দিয়ে একটা ছিদ্র ক'রে দাও।

এইভাবে ক্যামেরার চোখ ত ফুটালে, কিন্তু চোখ হলে চোখের একটা পাতারও ত দরকার হয়। এইজন্য আর একটা ঢাকনি তৈরী করতে হবে, যাতে ঐ ছিদ্র দিয়ে আলো প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা বন্ধ করা যায়। এই ঢাকনিটার ইংরেজী নাম হচ্ছে 'শাটার'। একটা সরু লোহার তার বেঁকিয়ে স্প্রীং ক'রে ওটা তৈরী করা কঠিন নয়। মশারীর কাপড়ে যে ছায়া পড়ে—কাপড়ের ওপর তার দাগ থাকে না। কাজেই ওর জায়গায় তোমাদের এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দাগটা থেকে যায়। 'ফিল্ম্' হচ্ছে সেই জিনিস। ঐ অন্ধকার বাক্সটির ছিদ্রটি যেদিকে করা হয়েছে তার বিপরীত দিকে রাখতে হবে ফিল্ম্। ফিল্ম্টা যদি লম্বা হয়, তা'হলে ওটাকে জড়িয়ে রাখতে হবে টেব্লিলের ওপর। রোলিং ক্যালেণ্ডার যেভাবে গুটিয়ে নেয় ঐভাবে দুটো কাঠির সঙ্গে জড়ানর ব্যবস্থা করতে হবে।

এই রকম ক্যামেরাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'পিন হোল ক্যামেরা'।

ক্যামেরার ছিদ্রপথে ঐ ঢাকনিটি—যাকে চোখের পাতা বলা হয়েছে, ওটাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় মাত্র খুলে রাখতে হবে—তার পরেই ওটাকে দিয়ে ঐ ছিদ্রপথ বন্ধ ক'রে দিতে হবে। নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুকে ফটোগ্রাফির ভাষায় 'একস্‌পোজার' বলা হয়।

সাধারণ 'Cutfilm'এর জন্য এই ক্যামেরার কিরূপ 'একস্‌পোজার' দরকার, তার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

বিষয় বস্তু	বাইরের অবস্থা		
	সূর্য্যালোকে	পাতলা মেঘে	কালো মেঘে
সমুদ্রতীরের বা দূরের দৃশ্য	৮ সেঃ	১৬ সেঃ	৩২ সেঃ
আকাশ	১৬ সেঃ	৩২ সেঃ	১ মিঃ
ফাঁকা মাঠ	৩২ সেঃ	১ মিঃ	২ মিঃ
কাছের বনপথ প্রভৃতি	১ মিঃ	২ মিঃ	৪ মিঃ

ফটো তোলার কৌশল সম্বন্ধে এখন সাধারণ ভাবে কিছু জানা দরকার।

ক্যামেরা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন আকারের দেখতে পাওয়া যায়। যে ক্যামেরাই হোক্—সেটাকে মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে রেখে এবং সূর্য্যের দিকে পিছন ক'রে ফটো তোলা উচিত।

বাজারে যে সব ক্যামেরা কিনতে পাওয়া যায়, তার ভালমন্দ নির্ভর করে—তার 'লেন্স্'এর ওপর। লেন্স্টা যেন আমাদের চোখ। চোখ যার ভাল নয়, সে যেমন সব জিনিস ঠিক ঠিক দেখতে পায় না, ক্যামেরারও তেমনি, লেন্স্ ভাল না হলে তার থেকে ভাল ছবি পাওয়া যায় না। দূরের জিনিস ভালভাবে দেখার জন্য বা ক্ষুদ্র জিনিস স্পষ্ট দেখবার জন্য আমরা যেমন চশমা ব্যবহার করি—কোন কোন ক্যামেরার লেন্স্এ তেমনি 'ফোকাস্' নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ বক্স ক্যামেরায়—বিষয় বস্তুর পাঁচ-সাত ফুট দূর থেকে ফটো তোলবার মত স্থায়ী 'লেন্স্'ই লাগান থাকে।

বিনা ক্যামেরায় ফটো

খুকু বায়না ধরেছে,—তাকে প্রজাপতির একটা ফটো তুলে দিতেই হবে। তার দাদা পার্থ বলছে—"দাঁড়া, একটা 'পিনহোল' ক্যামেরা তৈরী ক'রে নি আগে, তার পরে ত ফটো !"

খুকু বলে—"তুমি ওসব পরে ক'রো দাদা—আগে আমাকে ফটো তুলে দাও একটা।"

পার্থ হেসে বলে—"আরে এমন গাধা মেয়ে ত দেখি নি—ক্যামেরা না হলে ফটো হবে কি ক'রে ?"

খুকু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—"হবে, খুব হবে। তুমি দেবে না তাই বলো।"

পার্থের দাদা কানু পড়ে কলেজে। বিজ্ঞানের ছাত্র সে। খুকুকে সে আদর ক'রে বলল—"আমিই তোমাকে ফটো তুলে দেব খুকু, ক্যামেরা লাগবে না। কিন্তু তুমি বল, ফুলদানী থেকে ফুল চুরি করবে না, আমার লাল পেন্সিলে হাত দেবে না।"

খুকু হাত বাড়িয়ে বলল—"দাও ফটো। আমি বলছি—কিচ্ছু করব না।"

"বেশ ! তা'হলে ফটো তৈরী করছি। কিন্তু বিনা ক্যামেরায় প্রজাপতিটার ফটো তুলতে গেলে ওটা মরে যাবে যে। প্রজাপতি মরে গেলে সে আর রঙিন পাখা মেলে উড়তে পারবে না—তার খেলার সাথীরা তার জন্যে কত কাঁদবে। তুমি একটা সুন্দর ফুল কি একটা পাতার ফটো নাও।"

"আচ্ছা !"

খুকু ঘাড় নাড়িয়ে জানাল তাতেই সে রাজী আছে।

কানু দু'খানা পরিষ্কার কাচ ফটো বাঁধানর দোকান থেকে একই মাপে কেটে আনল। কাঠের ক্লিপ তার আগেই তৈরী করা ছিল। তারপর সে ফটোর দোকানে গিয়ে এক প্যাকেট ছোট সাইজের সিলভার পেপার, আর কোয়াটার পাউণ্ড হাইপো কিনে আনল।

কানু পার্থকে জিজ্ঞাসা করল—"পার্থ, বল ত এটা কি ?"

পার্থ লাফিয়ে উঠে বলল—"দাদা, আমাকে একটু দাও।"

"বল আগে ওটা কি ?"

পার্থ বলল—"মিছরী !"

খুকুও হাত বাড়িয়ে বলে—"আমায় দাও দাদা, আমি মিছলী খাব।"

কানু তাদের বুঝিয়ে বলে—"ওটা মিছরী নয়। খবরদার খেয়ো না যেন। এটাকে বলে হাইপো।"

"খুকু, বল ত এটার নাম ?"

খুকু বলে—"ভাই পো !"

পার্থ হেসে বলে—"ভাই পো নয় রে বোকা হাইপো।"

কানু পার্থকে বলল—"চায়ের প্লেটে ক'রে খানিকটা জল আন দেখি।"

পার্থ জল নিয়ে এলে কানু তার মধ্যে এক চামচে হাইপো ছেড়ে দিয়ে তাকের ওপর তুলে রাখল শিশিটাকে। তারপর একটা সুন্দর পাতা নিয়ে কাচের ওপর রাখল।

এইবার সিলভার পেপারের প্যাকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে নিয়ে ঐ কাগজের ওষুধ-মাখানো পিঠটা ঐ পাতার ওপর রেখে অন্য কাচখানি দিয়ে চাপা দিয়ে দিল। তারপর ঐ দুটো কাচের দু'ধারে দুটো কাঠের ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে নিল—ঐ সিলভার পেপারটা যাতে দুই কাচের মধ্যে থেকে এদিক্ ওদিক্ স'রে না যায়।

এইবার কানুকে উঠানের রোদে যেতে হবে। সঙ্গে চলল খুকু, পার্থ, জাপানী, রেখা, চিত্রা, দীপু, বিন্টু এবং পাড়ার আরও কত ছেলেমেয়ে।

যে কাচখানির ওপর ঐ পাতাটি রয়েছে ঐ দিক্‌টা কানু রৌদ্রের দিকে ধ'রে রাখল ছয়-সাত মিনিট। সিলভার পেপারের ওষুধ-লাগানো দিকটা লালচে মত হয়ে ক্রমে কালো মত হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কানু ওটাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ক্লিপ দুটো খুলে ফেলল। তারপর ঐ সিলভার পেপারটা তুলে নিয়ে তাকের ওপর রাখা সেই হাইপো ভিজানো জলসুদ্ধ ডিসটা নামিয়ে নিয়ে এল।

কাগজটা ছেড়ে দিল সে ঐ জলের মধ্যে। কাগজটি পাঁচ-ছয় মিনিট ঐ হাইপোর জলের মধ্যে থাকায় রংটা তার পাল্‌টে গেল। এইবার আর একটি প্লেটে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলে ঐ কাগজটি বার বার ক'রে ধুয়ে নিল। সকলে তখন অবাক্ হয়ে দেখছে পাতাটির ফটো উঠে গেছে কেমন সুন্দর !

তারপর কানু একটা ক্লিপে ঐ ছবিটি এঁটে দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল শুকোতে। অবিকল ফটো হয়ে গেল পাতার ! ওই ভাবে শুধু ফুল-পাতা বা প্রজাপতি নয়, তোমাদের হাতে আঁকা যে কোনও ছবির ফটো তুলতে পার।

তিথি-নক্ষত্র দেখতে হলে আমরা খুঁজি পাঁজি। কেবল তারিখটা দেখতে হলে অবশ্য 'ক্যালেণ্ডার' বা দেয়াল-পঞ্জির দিকে তাকালেও চলে; কিন্তু সময় জানতে হলে আমাদের দেখতে হয় ঘড়ি।

আচ্ছা, এই যে চির প্রবহমান অনন্তকালের ভেতর থেকে—বছর, মাস, সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতি পৃথক্ ক'রে নেওয়া হয়েছে,—এটা কি ক'রে হ'ল? কেই বা করল?

কে করল বলা কঠিন এবং কোন্ সময় থেকে এরূপ ভাগ করা হয়েছে তাও বলা সম্ভব নয়। এগুলো বহু প্রাচীন। তবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই, এই সব বিভাগের মূলে কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক দুটি অবস্থাই বর্ত্তমান।

সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাকে ধরা হয়েছে বৎসর। আবার পাশ্চাত্য মতে চন্দ্র প্রায় চার সপ্তাহে যে সময়টা নেয়, তাকে Moonths বা Months অর্থাৎ মাস বলে ধরা হয়েছে। সপ্তাহ?—খৃষ্টানদের মতে ভগবান পৃথিবী-সৃষ্টির ছ' দিন পর একদিন বিশ্রাম করেছিলেন—সেই দিনটি হচ্ছে রবিবার। খৃষ্টানদের মতে এটা বিশ্রামের দিন। তারপর রবি (Sun), সোম (Moon) প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেও দেশী বা বিদেশী ইতিহাস আছে। এখানে স্থানাভাবে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

দিন-রাত বিভাগটা মানুষে করে নি—ওটা স্বাভাবিক। রাত থেকে দিন আলাদা এবং দিনের পর রাত ও রাতের পর দিন—প্রকৃতির নিয়মে আসবেই।

সময়ের এই বিভাগটা যে সময়ে যেই করুক,—আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের এই কল্পিত

কাল-বিভাগটা আজকের নয়—ওটা অতি পুরাতন এবং এইরূপ সময়-বিভাগের একটা প্রয়োজনও অনুভব করেছিলেন তাঁরা।

তখনকার দিনে লোকে অবশ্য হাতে রিষ্ট ওয়াচ বাঁধবার সুযোগ পান নি—কিন্তু ঘড়ি তৈরী তাঁরা করেছিলেন। জল, বালি (ভারত), সূর্য্যের ছায়া (ভারত ও মিশর), মোমবাতির ক্ষয় (আলফ্রেড) প্রভৃতি থেকে তাঁরা সময় নিরূপণ করতেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা ত এসব বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী ছিলেন। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত 'সূর্য্য-সিদ্ধান্তে' তার পরিচয় আছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আকাশের নক্ষত্র বা আলোর রশ্মি দেখেই রাত্রের প্রহর প্রভৃতি সময় নির্দ্ধারণ করতে পারতেন।

১ম চিত্র

যাক সে-সব কথা।

তোমরা একটা ঘড়ি তৈরী করতে চাও? ঘড়ি ত অনেক রকমের আছে—দেয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, হাত ঘড়ি এই সব। সূর্য্যঘড়ির কথা ভাবছ? হাঁ, ওটা করাও সহজ, তবে ওর থেকে সময় জানতে হলে আবার সূর্য্যকে চাই যে! না আমি এমন ঘড়ির কথা বলছি, যার থেকে ঘরের ভেতর ব'সেই সময় জানা যায় এবং তৈরী করাও যেটা খুব সোজা।

ক, খ, দুইটি টিনের কৌটা নাও (১ম চিত্র)। ক কৌটাটির ওপর খ কৌটাটি স্থাপন কর। খ কৌটার তলার কেন্দ্রে থাকবে খুব ছোট (যাতে প্রয়োজন মত পরে ওটাকে বড় ক'রে নেওয়া যায়) একটা ছিদ্র।

তারপর গ, ঘ দুইটি অবলম্ব বা শক্ত কাঠি খ কৌটার দুই পাশে বেঁধে নাও। এই গ, ঘ কাঠি দুটির মাথা যেন এমন ভাবে কাটা হয়—যাতে আর একটি মসৃণ গোল কাঠি (ঙ) সহজেই ঘুরতে পারে।

এই গোলকাঠির (ঙ) সঙ্গে একটি দড়ি (চ) বা সুতো জড়িয়ে তার অপর প্রান্তে একটি ভাসমান হাল্কা কাঠ (ছ), সোলা বা অনুরূপ কিছু বেঁধে দাও—যাতে খ কৌটার মধ্যস্থ জল ছিদ্র দিয়ে ক কৌটায় পড়ার ফলে ঐ খ কৌটার জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছ নেমে যেতে পারে।

এইবার ঘ লম্বের ঝ প্রান্তে পিচবোর্ড বা টিন দিয়ে একটা সময়-নির্দ্দেশক তৈরী কর। ঙ কাঠির এই দিককার শেষ প্রান্তের সঙ্গে একটা ঘড়ির কাঁটার মত তৈরী ক'রে নাও—যাতে চ দড়ি নীচের দিকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে ঙ কাঠিটি ঘোরে এবং এই ঘোরার ফলে ঐ কাঁটাটিও এক, দুই প্রভৃতি চিহ্নে পড়ে।

এখন একটি ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে—খ কৌটায় কতখানি জল দিলে এবং ঐ ছিদ্র দিয়ে কি ভাবে জল পড়লে (ছিদ্রের ছোট-বড় এর ওপর স্থির করতে হবে) প্রতি ঘণ্টায় ঐ কাঁটা
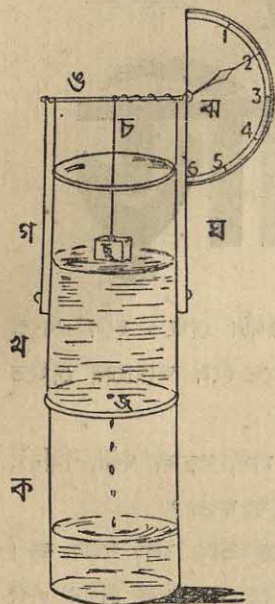
নিয়মিতভাবে ১, ২, ৩ প্রভৃতি স্থানে আসতে পারে। দেওয়াল বা হাত ঘড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে রাখলে এই ঘড়ি দিবারাত্র ঠিক সময় দিয়ে থাকে—অবশ্য মাঝে মাঝে খ কৌটায় জল ঢেলে দিতে হবে—ঘড়িতে যেমন দম দিতে হয় আর কি! কৌটা দুটি বড় করলে বা খ কৌটার ছিদ্রটি খুব ছোট রাখলে ছ', ঘণ্টার স্থলে বারো ঘণ্টাও চালানো যেতে পারে এই ঘড়ি। বিকাল একটা থেকে রাত্রি বারোটা—আবার তারপর থেকে ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ রাত্রি একটা থেকে দুপুর ১২টা—এক কথায় দিবারাত্র এই ঘড়ি সমানভাবে চলতে পারে।
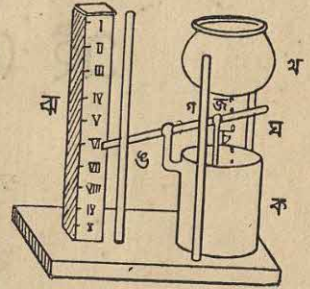
২য় চিত্র

এই পদ্ধতিতে গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে জল ঘড়ির প্রচলন ছিল (২য় চিত্র)। 'খ' হাঁড়ি থেকে 'ক' পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার ফলে 'চ' সূত্রটি উঠা-নামা করবে ; তার ফলে সময়-নির্দেশক ঝ কাষ্ঠফলকে ঙ কাঠি দ্বারা সময় নিরূপিত হবে।

এই লেখকের লেখা ঃ

পাল্কীবুড়ো—(গল্প)
বাদলা দিনের গল্প
আকাশগঙ্গা—(ভ্রমণ)
হাবুল চন্দোর—(গল্প)
আমার বন্ধু ভাস্কর--(গল্প)
দুর্গম পথের যাত্রী—(এ্যাড্‌ভেন্‌চার)
আবাদ করলে ফলত সোনা—(কৃষি)
বাংলার কুটীর-শিল্প—(গল্পে শিল্প-কথা)
দু'চোখ যেদিকে যায়—(কিশোর উপন্যাস)
শিকারী শশী ও লাঠিয়াল রামতনু—(কাহিনী)
রাজা সীতারাম—(স্ত্রী-চরিত্র বর্জ্জিত, ঐতিহাসিক নাটক)